অনুরাগ

সমরেশ মজুমদার

মিনিবাস থেকে নেমে জায়গাটা মোটেই পছন্দ হল না ভাস্করের। বাঁদিকটা মিনি বড়বাজার, সামনে গাড়ির জট পাকানো আবহাওয়া। ডানদিকে তাকালে একটা খেলার মাঠ দেখা যায় বটে তবে সেটা অযত্নে রাখা। খানিকটা নিচে পাহাড় কেটে বড় মাঠ তৈরি যিনি করেছিলেন তাঁর চেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানানোর বাসনা এখনকার কারও নেই। চারপাশের বাড়িঘর দোকানপাটও খুব পুরনো চেহারার।

অথচ সেবক ব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকে কালিঝোরা বাংলোকে রেখে উঠে আসবার সময় থেকেই মন প্রফুল্ল হচ্ছিল। এদিকে কখনই আসা হয়নি ভাস্করের। ডানদিকে খরস্রোতা তিস্তা আর চমৎকার ঝিমধরা পাহাড় দেখতে দেখতে বারংবার মনে হচ্ছিল দার্জিলিংয়ের পথের চেয়ে এর চেহারা-চরিত্র আলাদা। অথচ বাস-টার্মিনাসে নামার পর তার মন খারাপ হয়ে গেল। একটা ঘিঞ্জি এলাকা ছাড়া কিছু ভাবা যাচ্ছে না।

কিন্তু শীত পড়েছে জব্বর। এখন কলকাতায় ঘাম ঝরছে আর এখানে মনে হচ্ছে স্লিভের বদলে পুরোহাতা কিছু থাকলে ভাল হত। আর বিকেল তিনটেয় যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সন্ধ্যের পর ঘরের বাইরে পা দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

মিনিবাসের ছাদ থেকে মালপত্র নামানো হলে ভাস্কর তার সুটকেস তুলে নিল। তিনটে লোক ছুটে এসেছিল মাল বইবার জন্যে কিন্তু ভাস্কর তাদের হঠিয়ে দিল। ভাস্কর জানে সে বিরক্তিভরে কিছু বললে যারা জ্বালাতন করতে আসে তারা সব সরে যায়। হয়তো তার চেহারা এবং কণ্ঠস্বরে এমন একটা ব্যাপার যে আছে—কোনও দালাল বা পাণ্ডা তাকে ঘাঁটাতে চায় না।

ভাস্কর লম্বায় ঠিক ছয় ফুট। শরীরে সামান্য মেদের প্রলেপ থাকায় লাবণ্য আছে, ব্যায়ামবীরদের মত কাঠ-কাঠ ভাবটা নেই। কিন্তু তার চওড়া বুক, সরু কোমর এবং সুগঠিত হাত দেখলে বোঝা যায় শুধু ঈশ্বরের দান নয়, ওই শরীর-নির্মাণের পেছনে অধ্যবসায় আছে। মজার ব্যাপার, ঝামেলাবাজ মানুষেরা তাকে দেখেই বুঝতে পারে সুবিধে হবে না।

সুটকেসটা ভারি কিন্তু অসুবিধে হচ্ছিল না ভাস্করের। তিনটে জায়গায় সে উঠতে পারে। সার্কিট হাউস, টুরিস্ট লজ অথবা—। না, অন্য কোথাও তাকে উঠতে হবে আজ। সে যে এসেছে এখানে তা যত কম লোক জানতে পারে তত ভাল। শহরটাকে ভাল করে দেখে-শুনে তারপর আত্মপ্রকাশ করা যাবে।

বাজারের গায়েই সাইনবোর্ডটা নজরে এল, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা লজ'।

এখানেই ওঠা যাক। ভাস্কর স্থির করল একটা এ্যাটাচড্ বাথ আর পরিষ্কার বিছানা যদি থাকে তাহলে এই হোটেলেই আজকের রাতটা কাটানো যাক। সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকতে সে কাউণ্টারের গায়ে অলস ভঙ্গীতে বসে থাকা

এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। বৃদ্ধার শরীরে টিবেটিয়ান পোশাক। ওকে দেখে যে হাসি ওঁর ঠোঁটে ফুটল তা শুধু মায়েদের মুখেই দেখা যায়।

ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, সিঙ্গল রুম, এ্যাটাচড্ বাথ, খালি আছে?

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তারপর হিন্দীতে বলল, পঞ্চাশ টাকা করে লাগবে। একদিনের ভাড়া এ্যাডভান্স। খারাপ মেয়েছেলে ভাড়া করে রাত্রে শোওয়া চলবে না। ব্যাস।

ভাস্করের চোখে কৌতুক চলকে উঠল, ব্যাপারটা নতুন শুনছি। আমি যাকে আনছি সে খারাপ না ভাল তা তুমি বুঝবে কি করে?

আমি ঠিক বুঝতে পারি।

এই নিয়ম এখানকার অন্য হোটেলে চালু আছে?

মাথা খারাপ! তাহলে ওরা ব্যবসা করে খাবে কি করে?

তুমি ব্যবসা করতে চাও না?

আমার পেট ভরে গেলে হল। আমি আর আমার নাতনী, দুটো মাত্র পেট, তার জন্যে নোংরা ঘাঁটব কেন?

খাতায় নিজের নাম সই করার আগে যে দ্বিধা ছিল তা কাটিয়ে উঠল সে এক পলকেই। মিথ্যা কথা লেখার কি দরকার? এই মুহূর্তে এই শহরে কেউ তাকে চিনবে না। চাবি নিয়ে সে দোতলার যে ঘরটায় উঠে এল সেটা মোটেই বড় নয়। এই হোটেলকে শ্যাবি বলার যথেষ্ট কারণ আছে। এবং সম্ভবত সে ছাড়া অধিকাংশ বোর্ডারই হয় টিবেটিয়ান নয় সিকিমিজ। একটা অপরিচ্ছন্ন গন্ধ করিডোরে পাক দিলেও ঘরের বিছানাপত্র মোটামুটি ছিমছাম। বাথরুমের দরজাটা খুলে ভাস্করের মনে হল এইটেই বোধ হয় হোটেলের শ্রেষ্ঠ ঘর। নইলে এই চেহারার হোটেলের বাথরুমের অবস্থা এতটা ভদ্র হত না। শুধু ওপরের জানালাটা বেশ নড়বড়ে। জোরে হাওয়া দিলেই বোধ হয় খুলে পড়বে। ভাস্কর আবার ঘরে ফিরে এল। তারপর জুতোসুদ্ধু বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। এই শহরের অনেক প্রশংসা শুনেছে সে এতকাল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পর্যন্ত নানান প্রশংসাবাক্য লেখা হয়েছে। নিশ্চয়ই এই বাজার এলাকাই সমস্ত শহর নয়।

ঠিক এই সময় বন্ধ দরজায় জোর আঘাত শুরু হল। কেউ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দমাদম কয়েকটা লাথিও কষিয়ে দিল ওপাশের কাঠে। ভাস্কর উঠল। তারপর আচমকা দরজার পাল্লা হাট করে খুলে দিতেই একটা লোক হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে টেবিলে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলার জন্যে। লোকটার হাতে কয়েকটা প্যাকেট ছিল, সেগুলো ছিটকে গেল এদিক-ওদিকে।

ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে লোকটা। ঘরটা দেখতে দেখতে বলল, সরি। আমি ভেবেছিলাম আমার রুম। রুমমেট মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করছে বলে দরজা খুলছে না। শালা মালের ঘোরে ঘর বদলে ফেলেছি। মার্জনা করবেন দাদা।

দুটো হাত জোড় করল লোকটা।

প্রচণ্ড ক্রোধ শরীরে জন্ম নিয়েছিল, অনেক কষ্টে সংবরণ করল ভাস্কর। লোকটা রোগা, শরীর-ভর্তি গরম জামা সত্ত্বেও সেটা বোঝা যায়, এই বিকেলেই মাঙ্কি ক্যাপ সেঁটেছে মাথায় এবং ভালরকম মদ পেটে পড়েছে ওর। এই অবস্থায় ঘর পাল্টে ফেলা অসম্ভব নয়। সে চাপা গলায় বলল, বসুন!

বসব? রং নাম্বার হয়ে যাওয়ার পরও বসব?

রং নাম্বার?

ঘরের নম্বর। পাশাপাশি। অন্য ঘর হলে ছাতু হয়ে যেতাম এতক্ষণে, আপনি তবু বসতে বলছেন! সব মাইরি হেভি চেহারার টিবেটিয়ান বোর্ডার। শুধু আমার রুমমেট বাঙালী, অত্যন্ত নোংরা লোক।

পড়ে যাওয়া প্যাকেটগুলো তুলে লোকটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, আপনার বন্ধু?

না না। এখানে এসে আলাপ। আমি আজ রুম চেঞ্জ করব বলে ঠিক করেছিলাম। আর পারা যাচ্ছে না।

কেন? ভাস্করের মজা লাগছিল ওর কথা বলার ধরন দেখে। একটু খেঁকুড়ে কিন্তু মনে হচ্ছে সরল।

আরে মশাই, রোজ ঘরে ঢুকে দেখি আমার বিছানায় মাথার ক্লিপ, চুলের ফিতে পড়ে আছে। কাকে কি বলব? চেপে যেতাম। কাল রাত্রে শুতে গিয়ে নাকে সুড়সুড়ি লাগল। হাত দিয়ে দেখলাম ইয়া লম্বা একটা চুল, তাতে আবার সুবাসিত তেলের গন্ধ। আর পারলাম না। বলে ফেললাম। তিনি বললেন, তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা আসেন, বসার জায়গা কম বলে আমার খাটটাকে ব্যবহার করেন। আমি যেন কিছু মনে না করি! বুঝুন! কথাগুলো একটানা বলে সোজা হয়ে বসতেই একটা হেঁচকি উঠল।

ভাস্কর হাসল, হোটেলের মালিকানকে জানান। তিনি বলেছেন বাজে মেয়েদের এখানে ঢোকা নিষেধ। তাহলে এরা আসছে কি করে?

বাজে মেয়ে নয় তো। শিষ্যা। পঞ্চাশ বছরের গুরুদেব হোটেলে বসে আছেন আর শিষ্যারা আসছে একের পর এক। না চলি, দেখি ঘর খালি হল কিনা। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে ভাস্কর তাকে বাধা দিল, আর একটু বসুন। কি করেন আপনি? মানে আপনার পরিচয় এখনও জানা হয়নি।

শাজাহান সেন। স্রেফ বেড়াতে এসেছি এখানে। চাকরি একটা মার্চেন্ট ফার্মে। একান্নবর্তী পরিবার। সেখানে বাস করে মাল খাবার সুযোগ পাই না। মা জীবিতা আছেন, খুব কনজারভেটিভ পরিবার। বছরে দশদিনের জন্য ছিটকে বেরিয়ে এই জায়গায় এসে চুটিয়ে মাল খেয়ে যাই। এখানে মাল খাওয়ার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। মশাই-এর নাম?

দুনম্বর হেঁচকিটা এবার উঠল।

ভাস্কর চ্যাটার্জী। সেলস্-এ কাজ করি। কিন্তু শাজাহানবাবু, আপনার নামের সঙ্গে সেন উপাধি একটু গোলমেলে লাগছে না?

মোটেই না। আমার মায়ের প্রিয় কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের শাজাহান। আমি হিন্দু মুসলিম ব্যাপারের ঊর্ধ্বে। মায়ের প্রিয় কবিতার নামে আমার নামকরণ।

শাজাহান সামান্য টলছিল। কিন্তু সে যে মদ্যপান করেছে এটা কিছুতেই বোঝাতে চাইছিল না। যদিও ওর কথা জড়ানো তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ভাস্করের ভাল লাগছিল লোকটাকে। বলল, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। নইলে আবার কার ঘরে ধাক্কা দিয়ে বিপদে পড়বেন।

শাজাহান ঘাড় ঘুরিয়ে ভাস্করকে দেখল, আপনি মানুষটা তো দেখছি বেশ ভাল। বেশ, চলুন।

শাজাহানকে ধরতে হল না। ওর পায়ে এখনও বেশ শক্তি আছে। আসলে ভাস্করের খুব ইচ্ছে করছিল গুরুদেবটিকে দেখতে। সুযোগটাকে কাজে লাগাল সে।

শাজাহানবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। ভাস্কর বাইরে থেকে খুব ভদ্রভাবে আওয়াজ করল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া এল না।

শাজাহান চাপা গলায় বলল, কেসটা বুঝতে পারছেন? আমার ঘর অথচ আমাকে তীর্থের কাকের মত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

তৃতীয়বার আঘাতের পর দরজা খুলল। অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গীতে একটা শুঁটকো চেহারার লোক ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, কি, ইয়ার্কি হচ্ছে? যে-ই যায় সে-ই একবার দরজায় শব্দ করে। গুরুদেব একটু শান্তিতে সাধনা করবেন তার উপায় নেই। ও আপনি! তা আপনার এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কি প্রয়োজন পড়ল? বললাম না, দূরবীন দাঁড়া পর্যন্ত বেরিয়ে আসুন!

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে যে। তারপর মাইরি ঠান্ডাটাও। বাইরে ঘুরতে পারলাম না।

শাজাহানের কণ্ঠস্বর হঠাৎ একদম পাল্টে গেল যেন। মিনমিন করছে।

আসুন।

শাজাহান ভেতরে পা বাড়ানো মাত্র দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভাস্কর বুঝতে পারছিল না কি করবে। সে শাজাহানের সঙ্গে এসেছে এখানে। ঘরটার অর্ধেক অধিকার শাজাহানের। অতএব সে ওর অতিথি হিসেবে ঢুকতেই পারে ঘরে। কিন্তু লোকটা এখানে আসা মাত্র অমন পাল্টে গেল কেন? যেন খুব ভয় পাচ্ছিল সামান্য প্রতিবাদ করতে। তাছাড়া লোকটা তাকে দেখা সত্ত্বেও মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। ব্যাপারটা অত্যন্ত অপমানজনক হলেও ভাস্কর মত পাল্টালো। ঠিক এখনই ঘরে ঢোকা উচিত হবে না। শাজাহানবাবুর সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছে তখন যে-কোনো সময় ওর খোঁজে হাজির হওয়া যাবে।

নিজের ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল ভাস্কর। কাউণ্টারে সেই বৃদ্ধার হাতে এখন জপের মালা। মালা ঘোরাতে ঘোরাতেও ভদ্রমহিলা যে আড়চোখে তাকে দেখে নিলেন তা টের পেল সে।

BANGLAPDF.NET

পাহাড়ী শহরগুলোর একটা চরিত্রগত মিল আছে। বিকেলের ছায়া ঘন হলেই চারপাশ কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। একটা অদ্ভুত মায়াবী কিন্তু গা-ছমছমে ভাব প্রতিটি পথের বাঁকে ওৎ পেতে থাকে। বাজার এলাকা এবং বাসস্ট্যাণ্ড গাগে গায়ে। সেটা পেরিয়ে ওপরের রাস্তায় উঠে আসতেই মন ভাল হয়ে গেল ভাস্করের। চমৎকার সুন্দর সাজানো রাস্তার দুপাশে দোকান। এই দোকানগুলো নিশ্চয়ই ট্যুরিস্টদের জন্যে। রাস্তাটায় একটা কুটো পড়ে নেই। সামান্য এগোতেই একটা তেমাথা পেল সে। তেমাথার পাহাড়ের গায়ে সুন্দর একটা ম্যাপ এঁকে শহরের কোথায় কি আছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভাস্কর ম্যাপটার সামনে দাঁড়াল। দুরবীন দাঁড়া নামের জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূরে। অথচ সেখানেই শাজাহানকে পাঠাচ্ছিল লোকটা। নির্ঘাৎ ওদের সময় প্রয়োজন ছিল। শাজাহানকে ওরা এখনই ঘরে রাখতে চাইছিল না। তারপরেই ভাস্করের খেয়াল হল, শাজাহান বলেছিল সে ছাড়া আর একজন ওই ঘরে থাকে যে নাকি গুরুদেব। তাহলে ওই সিড়িঙ্গে-মার্কা লোকটা কে? ওটাকে তো কখনই গুরুদেব বলে মনে হল না। ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে ফেলল ভাস্কর। খামোকা সে শাজাহানকে নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছে। এইজন্যে তো সে এখানে আসেনি। শাজাহানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সামান্য আগে। ওকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যাচ্ছে।

ম্যাপের ওপর কয়েকবার চোখ বোলাবার পর শহরটা মাথায় বসে গেল।

কয়েক পা হাঁটাহাঁটি করা মাত্র সন্ধ্যে নামল অসাড়ে। বোঝা গেল আশে-পাশের দোকানে আলো জ্বলে ওঠায়। এই রাস্তার প্রতিটি দোকান চমৎকার সাজানো এবং টিবেটিয়ান বা সিকিমিজ সেল্‌সম্যান কাউণ্টারে। দোকানপাটের এলাকাটা পার হতেই চোখ জুড়িয়ে গেল ভাস্করের। এই শহরটাকে কেন এত সুন্দর বলা হয় তা মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল। এ-পাহাড় থেকে সে-পাহাড় যেখানেই শহরটা গড়িয়েছে সেখানেই টুকরো টুকরো আলোর হীরে জ্বলছে। আর কি নয়ন-ভোলানো ভ্যালি। এই আবছা আলোয় আরও মায়াবী মনে হচ্ছে।

ব্যাপারটা মাথায় রেখে হাঁটতে লাগল ভাস্কর। দুপাশে লম্বা লম্বা দেওদার গাছ। অন্য পাহাড়ী শহরের সঙ্গে এর পার্থক্য এটাও। প্রচুর গাছ দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে গার্ড অফ অনার দেবার ভঙ্গীতে।

ক্রমশ পথ আরও নির্জন হয়ে গেল। এবং নীচের জঙ্গলের মাথায় একটা প্রায় গোল চাঁদ আবদারের ভঙ্গীতে উঠে বসল। পায়ের তলায় চাঁদ, কবি হলে বোধ হয় এমনটা বলা যেতে পারত।

BANGLADDHIET

রাস্তার নাম ক্লিন হার্ট রোড। নির্মল হৃদয় সরণি। চমৎকার রাস্তাই। এদিকের বাড়িগুলোও লাগোয়া নয়, একটার সঙ্গে আর একটার ফারাক বেশ। এর গেট থেকে মূল বাড়ির প্রভেদ অনেকটা। প্রত্যেকটা বাড়ির গেটে ইংরেজীতে লেখা হয়েছে—কুকুর থেকে সাবধান। এই রাস্তায় সেই বাড়ীর মালিকান থাকেন কিন্তু কোন বাড়ি তা ঠাওর করা যাচ্ছে না। রাস্তায় লোক নেই যে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া যাবে তার কাম্য বাড়ি কোনটি। গেটে কোন নম্বর নেই। ঠিক এই সময় পেছনে মোটরবাইকের আওয়াজ উঠল। ভাস্কর স্বস্তি পেল। যদি এই শহরের বাসিন্দা হন, নিশ্চয়ই হবেন, নইলে সন্ধ্যের পর এমন অঞ্চলে বাইক চালাতেন না। ভাস্কর দেখল নিচের রাস্তা বেয়ে এঁকে-বেঁকে মোটর-বাইকটা ওপরে উঠে আসতে আসতে থেমে গেল। চালক একটা গেটের সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে যেন আচমকাই মিলিয়ে গেল।

ভাস্কর ধীরে ধীরে ফিরে এল মোটর-বাইকটার কাছে। খুব দামী এবং শক্তিশালী বাইক। নাহলে এই পাহাড়ে এত স্বচ্ছন্দে ছুটতে পারত না। ঠিক তখনই গেট পেরিয়ে বাগান আর বাগান পেরিয়ে সুন্দর বাড়িটার একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ভাস্করের কেমন যেন অনুভূতিতে এল, এইটেই সেই বাড়ি। কিংবা বাড়িটি যদি অন্য কারো হয়, তাহলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে হদিস নিয়ে আসা যায় মহিলার বাড়ি কোনটি!

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ভাস্কর। চমৎকার গন্ধ ছিটোচ্ছে বাগানের ফুলগুলো। কিন্তু ভেতরে পা দেওয়া মাত্র একটা অদ্ভুত শিরশিরে নির্জনতা চেপে ধরল। ঝিঁঝিঁ ডাকছে বিশাল গাছগুলো থেকে। পাহাড়ী এই গাছগুলোর একটা চরিত্র আছে। ঝিঁঝিঁগুলো তাদের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নেয়। ভাস্কর খালি বারান্দায় পা রাখতে যাচ্ছে তখনই গলাটা ভেসে এল। হিসহিসে তীক্ষ্ণ গলা, যাতে ঘেন্না এবং জ্বালা স্পষ্ট, আবার কি দরকার? তোমাকে আমি বলে দিয়েছিলাম এখানে না আসতে!

মহিলার বয়স অনুমান করা মুশকিল কণ্ঠস্বর থেকে। কিন্তু বেশ কর্তৃত্ব আছে স্বরে। ভাস্কর বারান্দা থেকে পা নামিয়ে নিল। একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে ঘুরে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। জানালাটা বন্ধ, কাঁচের ভেতরে পর্দা আছে। এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল সে। ছেলেটি, সম্ভবত যে প্রবেশ করেছে, বাইক থেকে নেমে বলল, কিন্তু আমার যে না এসে উপায় নেই!

উপায় নেই মানে? কি বলতে চাও? মহিলাকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল।

শীতল গলায় ছেলেটি বলল, গলা নামিয়ে কথা বল। চিৎকার করে কেউ কথা বললে আমার সহ্য হয় না। তারপর হঠাৎ একটু হাসি জড়ানো সেই গলায়, তোমায় না দেখে থাকতে পারি না।

মিথ্যে কথা। একশ ভাগ মিথ্যে। তুমি টাকার ধান্দায় এসেছ।

টাকা! ছেলেটি আবার হাসল, হ্যাঁ, সেটাকেও ভালবাসি। তোমাকে তো নিয়ে যেতে পারব না বাইকে চাপিয়ে, ওটাকে পারব, দাও।

আমি আর টাকা দিতে পারব না।

দিতে হবে।

সে রকম কোনো কথা ছিল না।

ছেলেটি হাসল, রাগ করলে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায়। বিশেষ করে তোমার গজদাঁতটা। বিউটিফুল!

মেয়েটি বলল, আমি রাগ করতে যাব কোন্ দুঃখে?

ছেলেটি বলল, সত্যি রাগ করোনি? তাহলে দুটো হুইস্কি খাওয়াও।

মেয়েটি বলল, আগে বল তুমি ব্ল্যাকমেইল করতে আসোনি?

ছেলেটি জানাল, সে-সব কথা পরে হবে। আগে হুইস্কি!

মেয়েটি বলল, ঠিক আছে।

ভাস্কর আর অপেক্ষা করল না। খুব সতর্ক পায়ে সে বাগান ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল। কয়েক পা হাঁটতেই এক বৃদ্ধ দম্পতিকে সে এগিয়ে আসতে দেখল বাজারের দিক থেকে। বৃদ্ধের হাতে ছড়ি, বৃদ্ধা তাঁর কনুই আঁকড়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছেন। কাছাকাছি হতে ভাস্কর দেখল এঁরা বাঙালী নন। চেহারায় বিদেশী কিংবা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মনে হয়। তবে এই এলাকার বাসিন্দা তা বৃদ্ধের হাতে বাজারের ব্যাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে। ভাস্কর ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করল, এটাই ক্লিন হার্ট রোড, তাই না?

ইয়েস। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তেই বৃদ্ধা হাত ছেড়ে রুমালে মুখ মুছলেন। এই ঠাণ্ডায় যেন ওর মুখে ঘাম জমছিল।

মিসেস জুলি শেরিংয়ের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

বৃদ্ধ একটু বিব্রত চোখে বৃদ্ধার দিকে তাকাতে বৃদ্ধা জানালেন, দ্যাট টিবেটিয়ান লেডি।

আই সি ! বৃদ্ধর এবার মনে পড়ল, তুমি অনেকটা এগিয়ে এসেছ মাই বয়। ওই যে রাস্তাটা, যেখানে বাঁক নিয়েছে, তার গায়েই দেখবে শেরিংদের গেট। বাঁ-দিকের নিচের কটেজ। ওটা আগে ছিল মিটার হ্যারল্ড টমসনের। মাই ওল্ড ফ্রেন্ড। টমসন অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাওয়ার সময় শেরিংদের বিক্রি করে গেল। টমসন ছিল বিরাট পুলিস অফিসার আর শেরিংরা নাকি মদের দোকান চালায়। তাও কাণ্ট্রিলিকার।

ও জন, তুমি বড্ড বেশী কথা বলছ। বৃদ্ধা চাপা গলায় শাসন করতে বৃদ্ধ যেন সতর্ক হলেন, ওয়েল, নাইস টু মিট য়ু জেণ্টলম্যান, গুড নাইট ! ভাস্করকে ছাড়িয়ে টুক টুক করে ওরা উঠে গেলেন ওপরে।

না আর কোন সন্দেহ নেই। সে জুলি শেরিংয়ের বাড়িতেই ঢুকে পড়েছিল। চটপটে পায়ে সে পা চালাল শহরের দিকে। এর মধ্যে জম্পেশ অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। আজ আর কোন কাজ নয়। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে টেনে ঘুম। প্রথম দিনেই একটা নাটক শুনতে পাবে এমনটা কে আশা করেছিল !

সেই সুন্দর রাস্তায় এখনও দোকানপাট খোলা। তবে পথে তেমন মানুষজন নেই। আলো জ্বলছে তবে দার্জিলিংয়ের মত এখানে টুরিস্টদের ভিড় নেই। ভাস্করের মনে পড়ল তার হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। বাইরে যদি খেতে হয় তাহলে এখানকার কোনো রেস্তোরাঁতে খেতে যাওয়াই ভাল। ঘড়িতে এখন আটটাও বাজেনি। হঠাৎ তার সেই কাণ্ট্রিলিকার শপের কথা মনে পড়ল। আজ একবার সেখানে গেলে কেমন হয় ? যদিও একটু আগে ঠিক করেছিল আজ আর কোন কাজ নয়, তবু তাকে এখন দোকানটা টানছে, ওই নাটকটা শোনার জন্যেই হয়তো। সে একটা পানের দোকানদারকে সিগারেট কেনার অছিলায় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, আজ এই শহরে ড্রাই-ডে। সমস্ত মদের দোকান বন্ধ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে হোটেলের দিকে ফিরছিল ভাস্কর। রাস্তাটা অন্ধকার। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নামতে হয়। খানিকটা অন্যমনস্ক ছিল সে। তিন লক্ষ টাকার ইনসুরেন্স ক্লেইম করেছে জুলি শেরিং। লোকাল অফিস সেটাকে ফরোয়ার্ড করেছে কলকাতার অফিসে। মিস্টার শেরিং ভারতবর্ষে এসেছিলেন বাষট্টি সালে। চীন যখন তিব্বত দখল করল তখন যেসব টিবেটিয়ান এদেশে পালিয়ে আসেন নানারকম সঞ্চয় নিয়ে মিস্টার শেরিং তাঁদের মধ্যে একজন। প্রথমে আশ্রিত, তারপর ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পেয়ে যান ভদ্রলোক।

এই শহরে এসে টিবেটিয়ান দেশী মদের একটা ভাল দোকান খুলে বসেন। আর খোলামাত্র ব্যবসাটা জমে উঠল তাঁর। এ সবই সম্ভব, ঠিক। কিন্তু সেই মানুষটা মরে গেলেই তিন লক্ষ টাকা ইনসুরেন্স কোম্পানীর কাছে ক্লেইম পাঠানো হবে এবং কোম্পানী তা মেনে নেবে, এটা যেন একটু বেশী রকমের বাড়াবাড়ি। ব্যাপারটা তিরিশ হাজার হলে কোম্পানী গায়ে মাখত না। কিন্তু তিন লাখ বলেই কর্তাদের টনক নড়ছে। আর প্রিমিয়াম নেওয়া হয়েছে বড়জোর চারটে।

ফলে কোম্পানী একটা নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিশাল পাহাড়ী অঞ্চলে যে সমস্ত ইনসুরেন্স ক্লেইমে রহস্যের গন্ধ থাকবে সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা দরকার। এবং এই উদ্দেশ্যেই ভাস্করকে এখানে পাঠানো। ভাস্কর কোম্পানীর গোয়েন্দা বিভাগের খুব নামকরা অফিসার। সন্দেহজনক দাবীর কেস এই অঞ্চল থেকে গেছে পাঁচটি। প্রত্যেকটির সুরাহা করে ফিরতে কত সময় লাগবে কেউ জানে না। হয়তো ছয় মাস, কিংবা এক বছর। তবে ভাস্কর যে এখানে আসছে তা কোম্পানীর লোকাল অফিস জানে না। সে নিজেই চায়নি ওরা আগে থেকে জেনে যাক। বলা যায় না, হয়তো সর্ষের মধ্যেই ভূত বিচরণ করছেন!

দিনের বেলায় বাস-স্ট্যাণ্ডে যেরকম অভদ্র ব্যস্ততা থাকে এখন এই সন্ধ্যে পেরনো সময়টায় তা নেই। কিছু মিনিবাস দাঁড়িয়ে আছে বটে, সেগুলোর আলো নেভানো এবং লোকজন নেই। এখনও শহরটাকে ভাল করে দেখা হয়নি, কিন্তু অনুমানেই বলা যায়, এই জায়গাটা চোর বদমাস গুণ্ডাদের আরামের। কারণ এইখানেই পাঁচ মিশালি নিম্নবিত্ত মানুষেরা হল্লা করে কথা বলতে পারে। এখানে কোন রুচি বা শোভনতা ভ্রূ কুঁচকে থাকে না। একটা পান সিগারেটের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই ভাস্কর দেখতে পেল একটি অল্পবয়সী নেপালী ছেলে তাকে লক্ষ্য করছে। এই কি পেছন পেছন আসছিল? অন্ধকারে পায়ের আওয়াজটাকে ঠিক পাত্তা দেয়নি সে।

চট করে পানের দোকান ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর রাস্তার ধারের রেলিংয়ে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে নিচের খেলার মাঠটাকে নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে।

এবং তখনই ভাস্কর টের পেল ছেলেটি তার দিকে এগিয়ে আসছে শব্দহীন পায়ে। আসুক। আসতে দাও। ভাস্কর তার শরীরের মাস্‌ল একটু শক্ত করল না। যেন অত্যন্ত তন্ময় হয়ে সে আর্ট দেখছে। ঠিক তখনই কোমরে একটা ধারাল এবং তীক্ষ্ণ কিছু স্পর্শ করল এবং সেই সঙ্গে চাপা গলায় একটা হুমকি, জেবমে যো-হ্যায় নিকালো, নেহি তো খতম হো যায়েগা।

ভাস্কর হাসল। শব্দহীন। ছেলেটি নেহাৎই নভিস। নাহলে ওর আক্রমণটা একটু অন্য ধরনের হতো। সে ঠিক করল, জবাব দেবে না। শুধু ওই তীক্ষ্ণ ছুরির উপস্থিতিটাই তার অস্বস্তি বাড়াচ্ছিল। ছেলেটি এবার চাপা হুঙ্কার দিল, নিকালো!

চকিতে ভাস্করের ডান গোড়ালি পেছনে উঠে গেল ততটাই যতটায় ছেলেটির তলপেটে আঘাত করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে কুঁক্ করে একটা শব্দ হল। এবং চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাস্কর বাঁ হাতের পাশ দিয়ে দ্বিতীয় আঘাত করল ছেলেটির ধারাল ছুরি ধরা হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা উড়ে গিয়ে পড়ল খানিকটা দূরের চাতালে। ছেলেটি তখন দাঁড়িয়ে টলছে। ওর দুটো পা এক জায়গায় নেই। ভাস্করের আফসোস হল, এই দ্বিতীয় আঘাতটা করার কোন দরকার ছিল না। ছুরিটা হাতের মুঠো থেকে এমনিই খসে পড়ত।

ভাস্কর বাঁ হাত বাড়িয়ে ছেলেটির জামার কলার ধরল, তোর নাম কি?

ছেলেটি তখনও কথা বলার অবস্থায় ফিরে আসেনি। ভাস্কর ওকে এমন একটা ঝাঁকুনি দিল যে কিছু শব্দ ছিটকে এল মুখ থেকে। তা থেকে অন্তত এটুকু বোঝা গেল সে ক্ষমা চাইছে।

ভাস্কর ওকে ধরে নিয়ে গেল পানের দোকানের সামনে। দোকানদার এতক্ষণ বোবা চোখে দেখছিল। এখন মাথা নামিয়ে কাজের ভান করতে লাগল। ভাস্কর লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে, একে তুমি চেনো?

ওদের দিকে না তাকিয়ে পানওয়ালা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল, আর বেশী কিছু বলতে সে নারাজ। ভাস্কর এবার ছেলেটিকে বলল, তুই কি এইসব করে বেড়াস?

ছেলেটি ততক্ষণে বোধ হয় খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিল। খানিকটা জেদের ভঙ্গিতে সে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

চাকরি-বাকরি করিস না?

কই মুঝে নোকরি নেহি দেতা।

জেলে গেছিস?

হ্যাঁ, তিনবার।

ভাস্কর এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল। তারপর ওর জামাটা ছেড়ে দিল, যা ছুরিটা কুড়িয়ে নে। আমি ওই কাঞ্চনজঙ্ঘা লজে আছি। কাল খুব ভোরে আমার সঙ্গে দেখা করিস। তোর উপকার হবে।

ভাস্কর আর দাঁড়ালো না। তবে সে অনুভব করছিল ছেলেটি তখনও সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো হতভম্ব হয়ে গেছে, এরকম শিক্ষাপ্রাপ্তি ওর বোধ হয় এই প্রথম।

কাঞ্চনজঙ্ঘা লজের রিসেপশনিস্টের ডেস্কটা এখন খালি। একজন বৃদ্ধ টিবেটিয়ান উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর হাতের মালা ঘুরছে। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতে সেই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা স্পষ্ট অদ্ভুত ধরনের খাবার নিয়ে তিনি বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। ভাস্কর তাঁকে দেখে মাথাটা সামান্য দোলাল। বৃদ্ধা আড়চোখে তাকে দেখে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। ভাস্কর সিদ্ধান্ত নিল, এই টিবেটিয়ানরা নিশ্চয়ই কম কথা বলে আর যা বিদঘুটে গন্ধ এখানে, কাল সকাল হলেই হোটেল পাল্টাতে হবে।

শাজাহান সেনের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে। লোকটার খবর নেওয়া দরকার। তখন যেভাবে ঘরে ঢুকেছিল সেটা সুবিধের নয়। সে দরজায় নক্ করল। ভেতর থেকে কোন উত্তর এল না। আরও দুবার নক্ করার পর সে জোরে দরজাটাকে ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না ভাস্কর। বাঁদিক ডানদিকে চোখ বুলিয়ে সে দেখে নিল করিডোরে কেউ আছে কিনা. তারপর সামান্য নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের ভেতর পা বাড়াল। সুন্দর ধূপের গন্ধ পাক খাচ্ছে ঘরে। এবং শাজাহান সেন উপুড় হয়ে পড়ে আছেন তাঁর খাটে। এছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। ভাস্কর এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারল শাজাহান বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। এবং এই ঘুম স্বাভাবিক নয়। সে মৃদু গলায় ডেকেও সাড়া পায়নি। অথচ শাজাহানের পিঠ নিঃশ্বাসের তালে দুলছে। দুবার আলতো করে চড় মারল সে শাজাহানের গালে। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ভাস্কর আর অপেক্ষা না করে দ্রুত বেরিয়ে এল। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের তালা খুলল। আজ সন্ধ্যে থেকে একটার পর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু তলিয়ে দেখতে হবে। পাশের ঘরে নাটক চলছে, তা জুলি শেরিংয়ের ঘটনার চেয়ে কম চমক-প্রদ নয়।

স্কালটা এল টাটকা রোদ নিয়ে। কাঁচের জানালার বাইরে ঝকঝকে নীল আকাশ পাহাড়ের ওপর উপুড় হয়ে রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাস্কর বেল টিপল। এরা খাবার না দিক, চা অন্তত দিতে পারে।

BANGLABOI.NET

মিনিটখানেক বাদে একটি টিবেটিয়ান বালক দরজায় এসে দাঁড়াতে ভাস্কর হুকুমটা জানাল। ছেলেটা একটুও না হেসে চলে গেল। এবং তখনই দরজায় এল শাজাহান সেন, গুড মর্নিং! কেমন আছেন?

গুড মর্নিং! আসুন। কেমন আছেন? ভাস্কর স্বাভাবিক গলায় বলল।

আছি। ভাবছি আজই ফিরে যাব।

সে কি? কেন?

ওই ঘরে যা চলছে তারপর আর এখানে থাকা যায় না।

কি চলছে?

বলা নিষেধ।

অন্য হোটেলে যান।

অন্য হোটেলে গেলে আমায় শেষ করে দেবে শাসিয়েছে।

ভাস্কর এবার লোকটিকে ভাল করে দেখল। আপাতচোখে সরল বলেই মনে হয়। সে নিচু গলায় প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলবেন? হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

কোন লাভ হবে না।

এই সময় চা নিয়ে ঢুকল ছেলেটি। শাজাহানকে এই ঘরে দেখে যেন একটু অবাক হল সে। তবে মুখে কিছু না বলে সে বেরিয়ে গেল। শাজাহান বলল, এইটো আর এক চীজ। চায়ে মুখ দেবেন না। শরীর গুলিয়ে উঠবে।

কেন?

টিবেটিয়ান চা। হতকুচ্ছিত খেতে। বিশ্বাস না হয় চুমুক দিয়ে দেখুন। চায়ের দিকে তাকিয়ে ভাস্করের মনে হল কথাটা সত্যি। সে উঠে দাঁড়াল, আপনার হাতে কোনো কাজ আছে?

না। এখানে তো কাজ করার জন্যে আসিনি। দুপুরে বাস ধরব। ততক্ষণ আমি ফ্রি। কেন, কিছু করতে হবে?

চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। জায়গাটা আপনার চেনা। ভাল খাবারের দোকান কোথায় আছে দেখিয়ে দিন। শাজাহানের আপত্তি ছিল না। দরজায় তালা দিয়ে ভাস্কর বলল, আপনার ঘরে তালা দেবেন না?

শাজাহান মাথা নাড়ল, আমার রুমমেট ঘুমুচ্ছেন। দশ টাকা বেশী দিলে তখন আপনার সিঙ্গল রুমটা পেয়ে যেতাম। কিপ্টেমি করে যে কি ভুল করেছি!

বাইরে বেরিয়ে এসে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, কাল রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন?

খাওয়া-দাওয়া? কাল রাত্রে? আচমকা প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল শাজাহান, হঠাৎ এইরকম প্রশ্ন করছেন কেন? আমি কি খুব বেশী মাল খেয়েছিলাম কাল রাত্রে? আমার না, বেশী মাল খেলে খাবার খেতে ইচ্ছে করে না!

BANGLAPDF.NET

আপনি কাল রাত্রে বেশী মদ খাননি। আর যখন ঘরে ঢুকেছিলেন তখন তো সন্ধ্যে। নিশ্চয়ই গুরুদেবের সামনে মদ খাননি।

না, না। এইবার মনে পড়ছে। তাই বলি, এখন এত খিদে পাচ্ছে কেন? না, কাল রাত্রে কিছু খেয়েছি বলে মনে হচ্ছে না। চলুন ওই দোকানটায় চমৎকার চা করে। দেখছেন কেমন গরম গরম জিলিপি ভাজছে! আহা, চোখ জুড়িয়ে যায়!

সকালবেলায় মিষ্টি খাওয়া ধাতে নেই ভাস্করের। সে চা এবং একটা বিস্কুট খেল। শাজাহান গোটা ছয়েক জিলিপি শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল, স্টমাকটা একদম খালি হয়ে ছিল, প্রাণ জুড়োল।

ভাস্কর ঠাট্টা করে বলল, আপনি দেখছি অদ্ভুত মানুষ! রাত্রে মদ খান, ভোরে জিলিপি!

সিওর! আমার ডায়াবেটিস নেই, ব্লাডসুগার নেই, আমি খাব না কেন?

পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, কাল রাত্রে ঠিক কি হয়েছিল বলুন তো শাজাহানবাবু? আপনার হঠাৎ নেশা হয়ে গেল কি করে? যখন ঢুকলেন তখন তো সামান্যই ড্রিংক করেছিলেন, তাতে বেঘোর হবার কথা নয়! ভাস্কর একটু উস্কে দিতে চাইল।

কি হয়েছিল সত্যি আমার মনে নেই। ঘরে ঢুকে দেখলাম গুরুদেব শব-সাধনা করছেন। আমি ঢুকে পড়েছি বলে শিষ্যমহারাজ খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, এভাবে হুটপাট ঢুকে পড়বেন না। গুরুদেবের অর্চনায় বিঘ্ন হলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। গুরুদেব সেই অবস্থায় বললেন, বাক্‌সংযম কর বৎস। বরং ওকে প্রসাদ পাইয়ে দাও।

শিষ্যমহারাজ আমাকে মন্ত্রপূত কারণবারি পান করতে দিলেন। আমি দেখলাম নেশাটা জলো হয়ে এসেছিল, তাই সেটাকে জমাট করতে মেরে দিলাম পুরোটা। ব্যাস, আর কিছু খেয়াল নেই। শাজাহান বিবৃতি শেষ করল।

ভাস্কর খানিকটা অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, শব-সাধনা করেছিলেন, বললেন না? শব মানে ডেড বডি এল কি করে ওই ঘরে? আর এইসব তো শুনেছি তান্ত্রিকরা করে থাকেন!

শাজাহান ঠোঁটে একটা আওয়াজ করল, ডেড বডি হতে যাবে কেন, একটি মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে আর গুরুদেব তার পিঠে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করেন। মাইরি সব বলব আপনাকে, দেখলে সহ্য করা যায় না।

একটি মেয়ে মানে, রোজ কি একই মেয়ে আসে?

নো, নেভার! প্রত্যেক দিন তো নতুন মুখ দেখি।

ভাস্কর মাথা নাড়ল। লোকটা যে দু'নম্বরী তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই পাহাড়ে ও রোজ একটা করে মেয়ে পাচ্ছে কোত্থেকে? নাঃ, আজ যেমন করেই হোক লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। তবে লোকটা যদি এমন ধান্দাবাজ হয়, তাহলে ডাবল-সিটেড রুম নিতে যাবে কেন? কেন আর একজন অচেনা মানুষকে

রুমমেট হিসেবে সঙ্গে রাখবে ? ও তো স্বচ্ছন্দে সিঙ্গল-সিটেড রুম নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারত। এইখানেই খটকা লাগছিল ভাস্করের। শাজাহান লোকটা দু-নম্বরী নয় তো ? এইসব কথা বলে তার সঙ্গে অন্য মতলবে ভিড়ছে না তো ?

মুখে কিছু প্রকাশ করল না সে। বলল, শাজাহানবাবু, আজকের দিনটা থেকে যান। এতদিন কষ্ট করলেন, আর একটা দিন করলে কোন অসুবিধে হবে না। বুঝলেন ?

শাজাহান মাথা নাড়ল, আমি যে এ্যানাউন্স করে ফেলেছি !

সেটা শুনে গুরুদেব কি বলছেন ?

উনি খুব চটে গেলেন। বললেন, আমার নাকি ধৈর্য নেই, সংযম-শক্তি নেই। আমার দ্বারা সাধনা হবে না। আমি একটু তন্ত্রসাধনা শিখতে চেয়েছিলাম, তাই উনি খেপে গেলেন। আমি চলে যাব শুনে।

আপনার হঠাৎ ওসব শেখার ইচ্ছে হল কেন ?

মানে, এই আর কি ! রোজ মশাই ভৈরবী দেখতে দেখতে— ।

হো হো করে হেসে উঠল ভাস্কর। যাক, এতক্ষণে শাজাহানের মতলবটা বোঝা গেল। শাজাহান বেশ সংকুচিত হচ্ছিল, বলল, না না, এটা ঠাট্টার বিষয় নয়। আমি একটা বইতে পড়েছিলাম, টিবেটে তন্ত্রের প্রচার ছিল।

হাসি থেমে গেল ভাস্করের, টিবেটে ? হ্যাঁ, তিব্বতে তো শাক্ততন্ত্র প্রবেশ করেছিল। বুদ্ধের মন্দিরে শাক্তদের অনেক প্রতীক আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক মশাই ?

বাঃ, এই গুরুদেব তো অরিজিন্যাল টিবেটিয়ান !

টিবেটিয়ান ? হতভম্ব হয়ে গেল এবার ভাস্কর।

ইয়েস, অরিজিন্যাল ! যেহেতু উনি বুদ্ধের মতাবলম্বী নন তাই ওর জাতভাইরা তাঁকে এড়িয়ে চলে। তবে চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। শিষ্যমহারাজ বলেন, গুরুদেব নাকি পৃথিবীর যে কোন ভাষায় কথা বলতে পারেন। যোগীরা একটা স্টেজে চলে গেলে বোধ হয় ওই সব ক্ষমতা অর্জন করেন। তবে শিষ্যমহারাজ বাঙালী, একটু খেঁকুড়ে টাইপের।

লোকাল লোক ?

জিজ্ঞাসা করিনি।

সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল ভাস্করের কাছে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছিল। এবার শাজাহান জিজ্ঞাসা করল, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

এমনি, উদ্দেশ্যবিহীন বেড়ানো আর কি !

শাজাহান নিজের ঘড়ি দেখল, নটা বেজেছে, এখন একটু খাওয়া যাক।

কি খাবেন ?

সলজ্জ মুখ করল শাজাহান। তারপর শরীরটা বেঁকিয়ে বলল, যে জন্যে এই

পাহাড়ে একা একা ছুটে আসি। এখানে একটা সস্তার বার আছে!

এই সাত সকালেই মদ খাবেন?

সাতসকাল কোথায়? নটা বেজে গেছে!

টিবেটিয়ান মদ? ভাস্করের চোখ ছোট হল।

না, না। এই বাঙালীর লিভার ওসব সহ্য করতে পারে না। আমি পুরো ইংলিশ।

তাহলে আজ থেকে যাচ্ছেন?

বলছেন যখন আর একদিন মাল খাওয়া যাক।

BANGLADPI.NET

শাজাহানকে ছেড়ে উল্টো পথ ধরল ভাস্কর। ম্যাল রোডে আসা মাত্র সে মোটর-বাইকটাকে দেখতে পেল। তার আরোহী চোখে সানগ্লাস সেঁটে সিটের ওপর স্টাইলে বসে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটি বৃদ্ধ নেপালী। আরোহী ছেলেটির কথায় বারংবার মাথা নাড়ল লোকটি। তারপর আচমকা স্টার্ট দিয়ে মোটর-বাইকটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটি ডানদিকের রাস্তায়। সেই সময় ভাস্কর নেপালী ছেলেটিকে দেখতে পেল। দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাকে দেখছে। ভাস্কর চিনতে পারল। এই ছোকরাই গতরাত্রে ছিনতাই করতে এসেছিল। সে ইশারায় ওকে কাছে ডাকতে ছেলেটি এপাশ ওপাশ দেখে এগিয়ে এল, আপকো হোটেলমে গিয়া থা।

ভাস্করের মনে পড়ল ওকে সে দেখা করতে বলেছিল। সে মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, তোর নাম কি?

পদম বাহাদুর।

তুই ছুরি দেখিয়ে রোজ কত টাকা কামাস?

দশ বিশ পঞ্চাশ, কভি কভি একদম নিল।

এখন কি করছিস?

কুছ নেহি।

তুই এই শহরের সবকিছু জানিস?

হলুদ দাঁত বের করে হাসল পদম। তারপর ডান হাত সামান্য বাড়িয়ে বলল, এই হাতটাকে যেমন চিনি তার চেয়ে কম নয়।

তুই চাকরি চাস?

ফুঃ, কেউ আমাকে চাকরি দেবে না! সবাই জানে আমি কি করি। নিরাসক্ত মুখে কথাগুলো শোনাল পদম।

ভাস্কর হাসল, তুই যদি কথা দিস আর কখনও ছিনতাই করবি না তাহলে আমি তোর জন্যে চেষ্টা করতে পারি। তার আগে বল তো, এখানে দিশী মদ কোথায় পাওয়া যায়?

এবার যেন ছেলেটি স্বাভাবিক হল, অনেক রকমের দেশী মদ এখানে পাওয়া যায়। আপনি কোনটা চাইছেন বললে আমি এনে দিতে পারি। হাঁড়িয়া, চোলাই, পচাই আউর তিব্বতীরা যে মাল খায় তারও একটা বড় দোকান হয়েছে এখানে। তবে সেটাকে সাহেব দিশী মদ বলবেন কিনা জানি না। বহুৎ খারাপ গন্ধ আর তেমনি কড়া, কলজে জ্বলিয়ে দেয়।

ভাস্কর হাসল, এইরকম মদই আমার পছন্দ। দোকানটা কোথায়, তুই আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

পদম বাহাদুর ইতস্তত করছিল, আপনি ওখানে যাবেন না সাহেব। আমরাই যেতে চাই না। আসলে ওই দোকানের খদ্দের সব তিব্বতী। মাল খেলে ওদের মেজাজ খুব চড়া থাকে।

তোর চেয়েও?

মানে?

তোকে যদি আমি কব্জা করতে পারি তো ওদের পারব না! তাহলে বল তোর চেয়ে বড় শের এই শহরে আছে! ভাস্কর ইচ্ছে করে গলার স্বরে ব্যঙ্গ মিশিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মুখ ভ্যাটকাল। তারপর দুই কাঁধ নাচিয়ে বলল, চলুন। তবে গোলমাল হলে আমাকে দোষ দেবেন না। আমি যে কোনো নেপালীর সঙ্গে টক্কর নিতে পারি কিন্তু তিব্বতীদের হালচাল বুঝতে পারি না। ঠিক হ্যায়—।

পদম আগে আগে হাঁটছিল। রাস্তাটা ঢালু, বাঁদিকে নামছে। পদমের হাঁটা-চলার মধ্যে এক ধরনের বিদেশী ভাব আছে। অথবা বিলিতি ছবির প্রভাবও হতে পারে। অবশ্য এই শহরে বিদেশী ছবির চেয়ে হিন্দির পোস্টারই বেশী চোখে পড়ছে। তা ওদের নায়ক-নায়িকারাও তো আন্তর্জাতিক।

এখন সবে সকাল শেষ হয়েছে। নিচের রাস্তাটায় বেশ ভিড়। দোকানপাট আছে তবে ওপরের ম্যাল রোডের মত অত সাজানো নয়। কিন্তু ব্যবসাপত্র বেশ জমজমাট তা তাকালেই ধরা যায়। গলির মধ্যে ঢুকতে হল না। বড় রাস্তা থেকে একটা কাঠের সাঁকো সোজা থেমেছে একটা কাঠের বারান্দায়। বাড়িটার ওপর ইংরেজি এবং সম্ভবত টিবেটিয়ানে লেখা রয়েছে। দ্বিতীয়টি বোঝার সামর্থ ভাস্করের নেই। প্রথমটির সরল অর্থ খুশমেজাজী পানশালা।

পদম বলল, আমি ভেতরে যাব না।

কেন? ভাস্কর অবাক হল।

পদম উত্তর দিল না। মাথা নামিয়ে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল যার অর্থ সে আর

এ বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। ভাস্কর আর জোর করল না। সে সাঁকোর ওপর পা রাখল। বেশ মজবুত সাঁকোর দুপাশে কাঠের রেলিং। বারান্দাটা ফাঁকা। কিন্তু সেখানেও কয়েকটা খালি বেঞ্চি, বোঝাচ্ছে ভেতরের ভিড় বেশী হলে ওগুলোর প্রয়োজন হয়। সে দরজায় দাঁড়ানো মাত্র একটা বিদঘুটে গন্ধ নাকে এল। তীব্র এবং শরীর-গোলানো গন্ধটায় এ্যালকোহল মিশে রয়েছে। গন্ধ না বলে হলঘর বলাই ঠিক। এই সময় তেমন ভিড় নেই। ভাস্কর গুনে দেখল মাত্র পাঁচজন পান করছে। এরা প্রত্যেকেই তিব্বতের মানুষ। কাউণ্টারে যে লোকটি পরিবেশন করছে তার চেহারা বিশাল। অনুমানে বোঝা যায় তিন-চারজন সাধারণ মানুষকে সে অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলতে পারে। ভাস্করকে দরজায় দাঁড়াতে দেখে লোকটা তার চেরা এবং প্রায় বোজা চোখ সমেত মাথাটা নাড়াল।

ভাস্কর ভাব-জমানোর হাসি হাসল কিন্তু লোকটির কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। তৎক্ষণে ভেতরে পা দিয়েছে ভাস্কর। হলঘরটির একটা বিশেষত্ব আছে। প্রতিটি টেবিলের সঙ্গে মাত্র একটি চেয়ার সাঁটা। অর্থাৎ তোমাকে পান করতে হবে একা একা। আড্ডা মেরে পাঁচজন মিলে খাওয়া এখানে চলবে না। যে পাঁচজন খাচ্ছে তারা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত এবং নির্বাক।

ভাস্কর অনেক খালি টেবিলের একটায় বসল। চেয়ার মোটেই আরামদায়ক নয়। এই ব্যবস্থা, নিশ্চয়ই, একজন মানুষ যেন অযথা সময় এখানে না কাটায় সেই কারণে। সে কাউণ্টারের দিকে তাকিয়ে দেখল স্বাস্থ্যবান লোকটি অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সে ইঙ্গিত করল কাউণ্টারের কাছে এগিয়ে যেতে। ভাস্কর একটু সময় নিল। লোকটার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে খুব বিরক্ত হচ্ছে। ভাস্কর এবার ইঙ্গিত করল লোকটাকে কাছে আসতে। দশ সেকেণ্ড তাকে দেখল লোকটা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের কাজে মন দিল। ভাবখানা এমন, চুলোয় যাও!

সাতসকালে মদ্যপান করার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। জায়গাটা তার দেখতে আসাই উদ্দেশ্য। এই পানশালার মালিক ছিলেন মিস্টার শেরিং। তিনি মারা গিয়েছেন। সকালবেলার খদ্দের দেখে অবশ্য ঠাওর করা যায় না এই পানশালার বিক্রি কত! তবে তিন লক্ষ টাকার জীবন-বীমা সাধারণ আয়ের মানুষ করে না। কাউণ্টারের পেছনে কয়েকটা ঘর আছে। সেগুলোয় কারা থাকে? একটি মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তা বা তার পরিবারকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বীমা করতেই পারে। কিন্তু ভাস্কর শুধু দেখবে মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যুতে কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই!

শেষ পর্যন্ত সোজা পায়ে ভাস্কর হেঁটে গেল কাউণ্টারে। তারপর সামান্য হেসে বলল, গিভ মি সাম টিবেটিয়ান ব্রেকফাস্ট!

নো ব্রেকফাস্ট, অনলি ড্রিংকস্! লোকটা চেরা চোখে তাকাল।

ইজ ইট টিবেটিয়ান ?

ইয়েস। ভেরি গুড। অনলি ইন দিস শপ !

আই সি। ঠিক হ্যায়। আই লাইক টিবেটিয়ান ড্রিংক। তবে এখন নয়। আজ বিকেলে আসব। গুডবাই। কথাটা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতেই ভাস্কর দেখল একটা গাড়ি এসে কাঠের সাঁকোর সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার দ্রুত নেমে দরজা খুলে দিতেই জুলি শেরিং গাড়ি থেকে নামল। সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্টারের লোকটা চঞ্চল হয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজায় ছুটে গেল। ভাস্কর চট করে বাঁদিকে সরে গেল যাতে ভদ্র-মহিলার সামনাসামনি না পড়তে হয়। ভদ্রমহিলা যথেষ্ট লম্বা, ছিপছিপে শরীর দুবার ঢাকা সত্ত্বেও বোঝা যায় ওঁর যৌবনে বেশী রকমের বাড়াবাড়ি। কিন্তু মাথা সোজা করে যখন চোখ নীল চশমায় ঢেকে হেঁটে এলেন তখন ভাস্কর ব্যক্তিত্ব শব্দটা মনে করতে পারল। লম্বাটে কিন্তু সুশ্রী মুখ। টিবেটিয়ানরা যেরকম ফর্সা হয় ইনি তার চাইতে একটু বেশী। বয়স অনুমান করা মুশকিল। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হলে বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু ভাস্কর জানে মিস্টার শেরিংয়ের একটি কুড়ি বছরের মেয়ে রয়েছে যে তিব্বতেই থেকে গিয়েছিল বাষট্টি সালে ভারতে পালিয়ে আসবার সময়। সেই মেয়ের মা যে এত অল্পবয়সী তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। কোনো কোনো চিত্রাভিনেত্রী নাকি বাহান্নতে বত্রিশে নেমে থাকেন ! এই মহিলা সেই কৌশলটি আয়ত্ত করেছেন।

জুলি শেরিং মদ্যপায়ীদের দিকে তাকাল না। গর্বিত পদক্ষেপে হলঘরটা পেরিয়ে ঢুকে গেল কাউণ্টারের পাশ দিয়ে ভেতরের ঘরে। আর স্বাস্থ্যবান লোকটি বশংবদের মত ওর পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত পৌঁছে বিনীত ভঙ্গীতে আবার কাউণ্টারে ফিরে এল। ভাস্কর আর দাঁড়াল না।

জুলি শেরিং নিয়মিত এই পানশালায় তদারকিতে আসেন। অর্থাৎ কর্মচারীদের ওপর দায়িত্ব চাপানোর মহিলা নন। ওঁর হাঁটার ধরন, মুখের গড়ন এবং গাম্ভীর্য বলে দেয়, এই মহিলা মোটেই সাধারণ রমণী নন। বাইরে বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা বাতাস নিল সে বুকভরে। ঘরের মধ্যে এই সময়টুকু থেকেই যেন নেশা হয়ে যাচ্ছিল। এই মদ সত্যিই তীব্র।

জুলি শেরিংয়ের সঙ্গে আজ কথা বলা যেতে পারত। সে যে উদ্দেশ্যে এসেছে তাতে কথা বলার সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে। কিন্তু না, আর একটু অপেক্ষা করা যাক। নদীর জল, মাটি, শ্যাওলা ইত্যাদি দেখার পর স্নানে নামাই ভাল।

রাস্তায় নামতেই পদম এগিয়ে এল, পিয়া সাব ?

ভাস্কর সত্যি কথা বলতে গিয়েও মত পাল্টালো। সে নীরবে এমন ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল যার অর্থ দুটোই হতে পারে। পদমের চোখ বিস্ফারিত হল, আপনার খাওয়া অভ্যেস ছিল নিশ্চয়ই ! ওই যে লোকটা কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে থাকে, ও বহুৎ বদমাস। একা তিনটে লোককে শুইয়ে দিতে পারে। আর ওই যে মেমসাহেব এই-মাত্র ঢুকলেন তিনি হলেন এখন দোকানের মালিকান। খুব ঘাঘু চীজ।

খবর পাওয়া যাচ্ছে। খুশি হচ্ছিল ভাস্কর। কিন্তু সেটাকে প্রকাশ না করে খানিকটা বিরক্ত প্রকাশ করল, একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে অভদ্র ভাষায় কথা বলছ কেন?

ভদ্রমহিলা! ও যদি তুড়ি মারে তাহলে যে কোনো লোকের লাস পড়ে যাবে। তিব্বতীরা পর্যন্ত ওকে এড়িয়ে চলে। ওর ডান হাত হল কাউণ্টারের লোকটা। ওই বারে মাতালরা ঝামেলা করতে সাহস করে না। ওর স্বামী যখন মারা গেল তখন অনেকেই সন্দেহ করেছিল মৃত্যুটা সাদা কিনা!

সাদা কিনা মানে? ভাস্কর সতর্ক হল কিন্তু ভঙ্গীতে প্রকাশ করল না।

মানে মানুষরা বলে বুড়ো স্বামীকে হয়ত ওর পছন্দ হয়নি!

কি ভাবে মারা গেল লোকটা? উল্টো পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল ভাস্কর। মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যুর বিশদ বিবরণ যে ফাইলে আছে সেটি সে পড়েছে। পুলিস মৃত্যুর পেছনে কোন অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করেনি। যে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন তিনিও বলেছেন মৃত্যুটা স্বাভাবিক। মিস্টার শেরিং কিছুদিন থেকেই বিভিন্ন অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। অনেক মানুষের সামনে ওই কাউণ্টারের ওপর লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি বুকের যন্ত্রণায়। এই অবধি কোন গোলমাল নেই। গোলমাল ছিল কিনা জানতেই তার এই শহরে আসা। অতএব এই ছেলেটি যদি কিছু তথ্য দিয়ে দেয়, গুজব যত বানানোই হয় একটা সত্যের বীজ থাকে সুদূর নেপথ্যে!

মদ খেয়ে। পদম হাসল, এ শালা তিব্বতী মদ কলিজা পুড়িয়ে দেয়। খুব মদ খেত লোকটা। কেউ কেউ বলে, ওই মদে কিছু মিশিয়ে দিত মেয়েটা। আবার কেউ বলে, মদ খেত বটে কিন্তু তার চেয়ে আর একটা নেশা ছিল বুড়োর!

কি নেশা? ভাস্কর হতাশ হচ্ছিল! ছেলেটার কথাগুলো সাধারণ গপ্পোবাজ অলস মানুষের বানানো। তার মধ্যে সত্যতা হয়তো আদৌ নেই এবং এ থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

ছোবল খেত লোকটা, সাপের ছোবল।

দূর! ছোবল খেলে তো মরে যাবে! এই নেশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সত্ত্বেও অজ্ঞ সাজল ভাস্কর।

হ্যাঁ যাবে, আপনি আমি মারা যাব। কিন্তু যাদের অভ্যেস আছে তারা ঠিক থাকে। তবে সে-সব সাপ খুব ছোট ছোট। বিষ সবে জমেছে। একটা কৌটোতে আটকে রাখা হয়। কৌটোর ওপরে ছোট্ট ফুটো থাকে। ছোবল খাওয়ার আগে খুব জোরে কৌটোকে নাড়ালে সাপটা রেগে যায়। তখন সেই ফুটোতে জিভ রাখলে সাপ ছোবল মারবেই। অত ছোট ফুটো, ছোট সাপ, বিষে তাই মানুষ মরে না কিন্তু জব্বর নেশা হয়ে যায়। সারাদিন পড়ে থাকে নেতিয়ে। আমেরিকাতে শুনেছি সাহেবরা ইঞ্জেকশনে ওই বিষ ঢুকিয়ে শরীরে নেয়। মানুষ বড় আজব জিনিস সাহেব। খুব বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল পদম।

মনে মনে তারিফ করল ভাস্কর। সাপের বিষ নেবার পদ্ধতিটা ও সঠিক না জানলেও কায়দাটার আন্দাজ আছে। মিস্টার শেরিং যে ওই নেশা করতেন তার প্রমাণ চাই। সে জিজ্ঞাসা করল, তুই সাপের বিষ কাউকে নিতে দেখেছিস? চোখের সামনে?

মাথা নাড়ল পদম, নাঃ। সাপকে আমার খুব ভয় করে। তবে নামচে বস্তিতে একজন তিব্বতী থাকে যে নাকি ওই ছোট ছোট সাপ ধরে বিষের কারবার করে। হয়তো ও-ই মাল দিত বুড়োটাকে!

নামচে বস্তি এখানে আছে?

হ্যাঁ, এখান থেকে মাইল দেড়েক হেঁটে গেলেই নামচে বস্তি।

তুই আমাকে সেই লোকটার কাছে নিয়ে যেতে পারবি?

কেন? এই প্রথম যেন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল পদম বাহাদুর।

আমি সাপ কিনব। মদ খেয়ে কোন কাজ দিচ্ছে না।

সাহেব, এটা ঠিক নয়। আপনি তিব্বতীয় মাল খেলেন তবু মনে হচ্ছে যেন চা খেয়ে এলেন। তার মানে মদ হেরে গেছে। কিন্তু সাপের বিষ যেসব মানুষ নেয় তারা শুনেছি মানুষ থাকে না!

ভাস্কর হাসল। ছেলেটা সত্যিকারের ছিনতাইবাজ নয়! জেল খাটলেও নয়। কিংবা ওসব হলেও মনের আনাচে-কানাচে কিছু নরম ব্যাপার আছে। মানুষের ভেতর আর একটা নরম মানুষ না থাকলে অন্যের সত্য উপলব্ধি করা যায় না। সে নীচু গলায় বলল, তোর সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত দরকার।

পদম বেশ ঘাবড়ে গিয়ে তাকাল।

ভাস্কর বলল, তুই তোর অভ্যেস ছাড়লে চাকরির ব্যবস্থা করব বলেছি। এ ছাড়া আমার সঙ্গে যে ক'দিন ঘুরবি তার জন্যে আলাদা টাকা পাবি, রাজি?

পদম হাসল, হেসে মাথা নাড়ল।

ম্যাল রোড় ধরে ওরা হাঁটছিল। এই সময় সেই মোটর-বাইকওয়ালাকে নিচে নেমে যেতে দেখল ভাস্কর। সে জিজ্ঞাসা করল, লোকটাকে চিনিস?

ঘাড় নাড়ল পদম, খুব ভাল ব্যাডমিণ্টন খেলে। সরকারী চাকরি করে। এখানকার মেয়েরা ওর জন্যে পাগল।

ক্রমশ ওরা এগিয়ে এল ক্লিন হার্ট রোডে। এখন এই রাস্তায় মোটামুটি লোক-চলাচল করছে। তবে জায়গাটা যেহেতু বড়লোকদের, তাই আজেবাজে মানুষজন নেই। ভাস্কর চটপট চারপাশে তাকিয়ে নিল। তারপর পদমকে বলল, তুই এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি ওই বাংলোর ভেতর যাব। কেউ গেট খুলে ঢুকছে দেখলেই সিটি বাজাবি। সিটি বাজাতে পারিস?

পদমের মুখ উজ্জ্বল হল, সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল, ভাস্কর বুঝল, অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িত কোনো মানুষ একজন সঙ্গী পেলে সুখী হয়। পদম এতক্ষণে তাকে ওইরকম কিছু ভাবছে।

জায়গাটা সামান্য নির্জন হওয়া মাত্র ছোট্ট পাঁচিল ডিঙিয়ে ভাস্কর ভেতরে ঢুকে পড়ল। দুপাশে ফুলের বাগান এবং লম্বা গাছের সারি। এই মুহূর্তে জুলি শেরিং বাড়িতে নেই। তার সাকরেদ স্বাস্থ্যবান মানুষটিও কাউণ্টার সামলাচ্ছে। রাত্রে যে মোটর-বাইকওয়ালা জুলিকে দেখছিল সেও নিচে নেমে গেছে। এখন এই মুহূর্তে বাড়িতে আর কে কে থাকতে পারে? এই বাড়ির ভেতরটা জুলির অজান্তে একবার ভাল করে দেখতে চায়। খুব বুদ্ধিমান মানুষও কখনও কখনও বোকার চেয়ে সাধারণ ভুল করে বসে। এক্ষেত্রে সেরকম কিছুর সন্ধান পাওয়া গেলেও যেতে পারে। মাথা নীচু করে ঢালু বাগান দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ভাস্কর যতটা সম্ভব ওই অবস্থায় যাওয়া যায়। হঠাৎ মাটির দিকে চোখ পড়তে ও কোনক্রমে গতি সামলাতে গিয়ে বসে পড়ল। তার চোখের সামনে তিনটে নগ্ন তার ছয় ইঞ্চির ফারাকে লাইন করে চলে গেছে বাড়িটাকে পাক খেয়ে। একটু অন্যমনস্ক, একটু বেশি গতি থাকলে ওই তারের সঙ্গে পায়ের সম্পর্ক হতই। এই তার কিসের? সামান্য ঝুঁকে ভাস্করের সন্দেহ হল খুব, ওই তারের ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলছে। পকেট থেকে একটা ছোট স্ক্রু-ডাইভার জাতীয় জিনিস বের করল সে। যার হাতলটা কাঠের কিন্তু ডগাটা লোহার। সাবধানে সেই ডগাটা একটা তারে ছোঁয়ানো মাত্র ভাস্করের ঠোঁটে হাসি ফুটল। বাঃ, চমৎকার! ওই তিনটে তারে পা পড়লে সে হয়তো মারা যেত না কিন্তু অজ্ঞান হয়ে আটকে থাকতে হতো যতক্ষণ না কেউ এসে তাকে উদ্ধার করে। নিজের অনুপস্থিতিতে বাড়িটাকে সুরক্ষিত করার চমৎকার ব্যবস্থা করে গেছে জুলি শেরিং।

পেছনে সরে এসে ভাস্কর লাফ দিল যতটা উঁচু দিয়ে সম্ভব, যাতে সে তিনটে তারের পরিধি ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলে আসতে পারে। এবং তখনই সে একটা চাপা শিষ শুনতে পেল। শিস দিতে দিতে কেউ বাড়িটার ডানদিক দিয়ে উঠে আসছে। চকিতে সে বাড়িটার বাঁদিকের একটা আড়ালে চলে এল। তার মনে পড়ল গতকাল যখন সে গেট খুলে এই বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত উঠে এসেছিল তখন কেউ তাকে বাধা দেয়নি এবং কোনো বৈদ্যুতিক তার পায়ের তলায় পড়েনি। সে ব্যাপারটা তো ওই মোটর-বাইকওয়ালার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। অর্থাৎ এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয় জুলি শেরিং যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তখনই। এবং তখনই ভাস্কর শিস দিতে দিতে আসা লোকটিকে দেখতে পেল। ছুম্বা জাতীয় পোশাকে দুটো হাত ঢুকিয়ে এক স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ় বাড়ির চারপাশে চোখ বোলাল। এবং তারপর বেশ উদাস ভঙ্গীতে এগিয়ে আসতে লাগল এপাশে। ভাস্কর নিশ্চিন্ত হল। লোকটা মোটেই সতর্ক নয়।

মিনিটখানেক বাদে অজ্ঞান মানুষটিকে টেনে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে শুইয়ে দিল ভাস্কর। এই বাড়ি খালি ভেবেছিল সে। অথচ একটি লোককে দেখা গেল। একাধিক আছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। ভাস্কর সতর্ক পায়ে এগিয়ে এল। এদিকটা বেশ ঢালু। লোকটাকে অজ্ঞান করতে একটু বেশী শক্তিব্যয় করতে হয়েছে। আচমকা আঘাত করার সময় লোকটার ঘাড়ে বেশী শক্তি প্রয়োগ করা ঠিক হয়নি। অন্তত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চেতনা ফিরবে না এটা সে নিশ্চিত।

বাড়ির পেছনে চলে এল সে। বাংলোটা খুব বড় নয়। বড়জোর গোটাচারেক ঘর এবং একটা হল থাকতে পারে। বাড়ির পেছনে একটা টুকরো লন পেরিয়ে আউট হাউস গোছের রয়েছে। তার একটা দরজা খোলা। বোঝা যাচ্ছে প্রৌঢ় লোকটি ওই ঘর থেকে বেরিয়ে টহল দিতে বেরিয়েছিল।

অভ্যস্ত হাতে জানালাটা খুলে ফেলল। এতদিন হয়ে গেল তবু এইরকম সময়ে মনে একটা গ্লানি জন্মায়। সন্তর্পণে সে ভেতরের কার্পেটে পা দিতেই মনে হল কোথাও মৃদুস্বরে একটা বাজনা বাজছে। তার মানে এই বাংলোয় মানুষ আছে। ভাস্কর সতর্ক চোখে তাকাল। এইটি বোধ হয় স্টোর রুম। প্রচুর জিনিসপত্র স্তূপ করা রয়েছে। সে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকল। এটা শোওয়ার ঘর বোঝা যাচ্ছে। পরিপাটি বিছানা। একটা মেয়েলি গন্ধ ঘর জুড়ে। সে ওয়ার্ডরোবের দিকে এগিয়ে গেল। অগুনতি মেয়েলি পোশাক। এটা নিশ্চয়ই জুলি শেরিংয়ের ঘর। এই টিবেটিয়ান মহিলার যা পোশাক আছে তা কোনো আধুনিক আমেরিকানদের লজ্জিত করবে। ওয়ার্ডরোবের নিচে দুটো ভারি সুটকেস। ও-দুটো খোলার সময় এখন নেই। তিন নম্বর ঘরটাতে ঢুকল সে। এটি কি স্টাডি রুম? প্রচুর বইপত্র সাজানো দেওয়ালে। ভাস্কর একটু অন্যমনস্ক হয়ে বইগুলো দেখছিল। এনসাইক্লোপিডিয়ার সারি। হঠাৎ মাঝখান থেকে একটা বই তুলে নিতেই ওর শরীর শক্ত হল। একটা ছোট নব রয়েছে দেওয়ালে। গোপন কিছু লুকোবার জন্যেই এত বইয়ের প্রদর্শনী। নবটা ধীরে ধীরে ঘোরাতেই পায়ের তলার কাঠের মেঝে নড়তে লাগল। ভাস্কর দেখল কার্পেটের একটা জায়গা যেন সামান্য নীচু হয়ে ঝুলছে। দ্রুত সেখানকার কার্পেট সরিয়ে নিতে সে সুন্দর একটা গর্ত দেখতে পেল। তিন ফুট বাই চার ফুট গর্তের মধ্যে দুটো কাঠের বাক্স। সে ছোট বাক্সটা তুলে চাপ দিতেই ডালাটা খুলে গেল। একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ এবং তার পাশে ছোট শিশিতে সামান্য তরল পদার্থ। ভাস্কর চোখের সামনে বস্তুটাকে ধরল। কাচের আড়ালে সাদা তরল পদার্থটি কি হতে পারে তা সে ঠাওর করতে পারছিল না। এইভাবে গোপনে কেন সিরিঞ্জের এই বস্তুটি লুকিয়ে রাখা হবে? শিশির জিনিসটি যে ওষুধ নয় তা টের পাওয়া যাচ্ছে, কারণ শিশির গায়ে কোন লেবেল নেই। বাক্স সমেত ও-দুটোকে সে পকেটে চালান করে দ্বিতীয় বাক্সে হাত দিতে গিয়েই চমকে

উঠল। তার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। তার অনুভূতির প্রতিটি পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছিল পেছনে কারোর উপস্থিতি। সে ধরা পড়ে গিয়েছে। যে এসেছে সে কোনো কথা বলছে না। ভাস্কর ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে নিল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে উঠে যখন মুখোমুখি হল তখন তার হাতে '৩৮ রিভলবার। সে দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে, তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির চোখে এতক্ষণ বিস্ময় ছিল, অস্ত্র তাকে ভীত করল। মুখে হাত চাপা দিয়ে সে একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। ভাস্কর ততক্ষণে ওটা পকেটে চালান করে দিয়েছে। তারপর দ্রুত নব ঘুরিয়ে কার্পেটটাকে সমান করে দিয়ে মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়াল, সরি, আমি সত্যি দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া আমার অন্য কোনো উপায় ছিল না।

মেয়েটি তখনও ভীত এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভাস্কর কথাগুলো বলেছিল ইংরেজীতে। কিন্তু তার একটি শব্দ মেয়েটি বুঝেছে কিনা তাতে তার সন্দেহ হল। সে এবার হিন্দীতে কথাগুলো বলল। মেয়েটির মুখে সামান্য স্বাভাবিকতা ফিরে এল। ভাস্কর দুটো হাত যুক্ত করে হিন্দীতেই বলল, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে চাই না। মেয়েটি যে এবারও সব বুঝেছে তা স্পষ্ট হল না। অর্থাৎ মেয়েটি ইংরেজী জানে না এবং হিন্দী সামান্য বুঝলেও বলতে পারে না।

অতএব ভাস্কর পৃথিবীর আদিম ভাষার সাহায্য নিল। দুটো হাতের এবং ঠোঁটের সাহায্যে নির্বাক কথা বলার চেষ্টা করল সে। বোঝাতে চাইল, আর মেয়েটির কোন ভয় নেই। সে কোনো ক্ষতি করবে না। বিশেষ প্রয়োজনে তাকে এখানে আসতে হয়েছিল। মেয়েটি ইংরেজী বুঝবে না ভেবে সে পকেট থেকে তার আইডেন্টিটি কার্ড বের করে মেয়েটির সামনে ধরল। মেয়েটি এতক্ষণ একাগ্র হয়ে ভাস্করের অঙ্গভঙ্গী বুঝবার চেষ্টা করছিল। এবার কার্ডটাকে দেখে হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিল। কার্ড খুলতেই ভাস্করের উজ্জ্বল ছবি। ছবির নিচের দিকে অফিসের স্ট্যাম্প রয়েছে। মেয়েটি ছবি এবং মানুষের মধ্যে দু'তিনবার দৃষ্টি বদল করল। তারপর তার ঠোঁটের কোণে এক-চিলতে হাসি ফুটল। তাই দেখে ভাস্কর খুব সরল হাসির চেষ্টা করল। মেয়েরা বলে থাকে যে ভাস্করের হাসিতে একটা মুখোশ আছে। তিনটে খুন করে এসেও ওই হাসি হাসলে মনে হয় সারল্য একেই বলে।

মেয়ে এবার পেছন ফিরল। তার ঘর থেকে ভেসে আসা বাজনা থেমে গেছে সেটা এতক্ষণে খেয়ালে এল। সে দ্রুত নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

ভাস্কর বুঝতে পারছিল না সে কি করবে। এই মুহূর্তে তার এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। মেয়েটি তার ভাষা ইচ্ছে করে না বোঝার ভান করছে কিনা তা সে জানে না। তাছাড়া সে যে এসেছে তার একটা সাক্ষী রয়ে গেল। যদি মেয়েটি ইংরেজী পড়তে পারে তাহলে কার্ডে তার নাম জেনে নিয়েছে। সেটা

বিরাট ভুল হয়ে গেল। আসলে মেয়েটির চোখ-মুখ এমন নিষ্পাপ সুন্দর যে ওর বিশ্বাস পাওয়ার জন্যেই কার্ডটি বের করে দেখিয়েছিল যে সে সাধারণ চোর বদমাস নয়। ব্যাপারটা হীতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, ভাস্কর যেন নিজের কাছেই স্বীকার করল, এমন সুন্দরী যুবতী মেয়ে সে আর কখনও দ্যাখেনি। কি অদ্ভুত জাদু আছে মেয়েটির নীল চোখে। আপেলের মত লাল গাল, ঈষৎ চাপা নাক অথচ সেটাই গোলাপী ঠোঁটের ওপর অদ্ভুত মায়াবী হয়ে আকর্ষণ বাড়িয়েছে। নিশ্চয়ই এই মেয়ে এদেশে বেশী দিন আসেনি। জুলি শেরিংয়ের মেয়ের তো তিব্বতে থাকার কথা। আর 'ক্লেইম'-এ বলা নেই মেয়েটি এই দেশে চলে এসেছে কিনা। কিন্তু আসতে ভিসা পাশপোর্টের প্রয়োজন। এদেশে চিরকাল থেকে যেতে চাইলে নাগরিকত্ব দরকার। ভাস্করের সন্দেহ হল মেয়েটি কোনো বৈধ ছাড়পত্র ছাড়াই এই দেশে এসেছে। এবং সেই কারণেই জুলি শেরিং ওকে প্রকাশ্যে বের করেননি। এই জন্যই মেয়েটি তার নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে কিংবা বুঝতে পারে না! কিন্তু জুলি শেরিংয়ের মেয়ের বয়স তো কুড়ি, অথচ একে দেখে ষোল-সতেরোর বেশী কিছুতেই মনে হয় না। ভাস্কর মাথা নাড়ল, মেয়েদের বয়স বুঝতে চাওয়া তাদের মনের চেয়েও কষ্টকর।

চলে যাওয়া উচিত অথচ মেয়েটি তাকে টানছে। এবং সেই মুহূর্তে পাশের ঘরে বাজনা বেজে উঠল। ভাস্কর কয়েক পা এগিয়ে মেয়েটির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। রেকর্ড-প্লেয়ারে একটা রেকর্ড চাপিয়ে মেয়েটি ওর দিকে অপাঙ্গে তাকাতেই ভাস্করের বুকের ভেতর পাক দিয়ে উঠল। সে হাসল, মেয়েটিও হাসল। এবার পরিষ্কার ঝকঝকে পাহাড়ি হাসি। সে হাত বাড়াল, অনেকটা করমর্দন করার ভঙ্গীতে। মেয়েটি একটু তার আঙুল স্পর্শ করা মাত্র বাইরে তীব্র সিটি বেজে উঠল!

চকিতে চেতনা ফিরে পেল ভাস্কর। সে ইশারায় মেয়েটিকে বোঝাল পরে দেখা হবে, তারপর দ্রুত ঘরগুলো পেরিয়ে জানালাটার কাছে চলে এল। এক লাফে সেটা ডিঙিয়ে বাইরে নামবার আগে সে দেখতে পেল মেয়েটি পেছন পেছন এসে তাকে পরম বিস্ময়ে চলে যেতে দেখছে।

বাগানে নেমেই সতর্ক হল ভাস্কর। পদম যখন সিটি বাজিয়েছে তখন কেউ না কেউ এ বাড়িতে ঢুকেছে। সে চারপাশে নজর বুলিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে আসতেই খেয়াল হল সেখানেই প্রৌঢ়টির অচেতন শরীর পড়ে আছে। বোধহয় প্রৌঢ়ের শরীরে তখন সাড় ফিরে আসছিল। ওর পেছনে সময় নষ্ট করার মত সময় আর নেই। কারণ গেট খুলে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। গাড়ির ড্রাইভার একজনটিবেটিয়ান নিচে নেমে চিৎকার করে কাউকে ডাকল। তারপর সাড়া না পেয়ে গাড়ির দিকে মুখ বাড়িয়ে কিছু জানাল। এইবার পেছনের দরজা খুলে গেল। ভাস্কর দেখল জুলি শেরিং

মাটিতে নেমে বাড়িটার দিকে এক পলক তাকাল। তারপর চাপা গলায় ড্রাইভারকে হুকুম করতেই সে একটু পিছু হটে দৌড়ে অনেকখানি লাফ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সীমানা পেরিয়ে এ পাশে চলে এল। ভাস্কর আবার দেখল জুলি শেরিংকে। শক্তসমর্থ মহিলা যে একদা মেয়ের মতই সুন্দরী ছিলেন তার প্রমাণ এখনও তার শরীরে। সে আর অপেক্ষা করল না। যতটা সম্ভব নীচু হয়ে সে তারের সীমানা লাফিয়ে প্রায় হামাগুলি দেবার ভঙ্গীতে উঠে এল পাঁচিলের গায়ে। পাঁচিল টপকাবার সময় যদি জুলি শেরিং এদিকে তাকায় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। এখানে কোন আড়াল নেই। ভেতরে তখন একটি বিশেষ নাম ধরে চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। বোধহয় অচেতন প্রৌঢ়কে খুঁজছে ড্রাইভার। ঠিক তখনই বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেয়েটি। আর তাকে দেখতে পেয়েই ক্ষিপ্ত হল জুলি শেরিং। চিৎকার করে বলল, গো ইনসাইড। তার পরেই নিজের ভাষায় অনর্গল কিছু বলতেই মেয়েটি ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ভেতরে চলে গেল। এই সুযোগটি হারাল না ভাস্কর। জুলি শেরিংয়ের উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে সে পাঁচিল টপকে রাস্তায় উঠে এল। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পদমের মুখোমুখি হল। দাঁত বার করে হাসছে পদম। ইশারায় তাকে সঙ্গে আসতে বলে দ্রুত পা চালাল ভাস্কর। ক্লিন হার্ট রোড ছাড়িয়ে আসার পর ভাস্করের মনে হল এবার একটু খাওয়া যাক। সকাল থেকে অনেক উত্তেজনা হয়েছে।

মোটামুটি একটা ভাল রেস্তোরাঁ দেখে সে পদম বাহাদুরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে চিকেন রোস্ট আর টোস্টের অর্ডার দিল। পদম এখন তার সামনে বসে পিটপিটিয়ে হাসছে।

সাহেব, একটা কথা বলব ?

মাথা নাড়ল ভাস্কর।

পদম বলল, আপনি আমার চেয়ে অনেক বড় ওস্তাদ। একটা চিড়িয়া পর্যন্ত ওই বাড়িতে ঢুকতে সাহস পায় না আর আপনি—। কথাটা শেষ করল না পদম কিন্তু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে ভাস্কর তার চেয়ে অনেক বড় দরের অপরাধী। ভাস্করের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে করছিল এক চড়ে ছেলেটার হাসি ভোঁতা করে দেয়। তার আফসোস হচ্ছিল এই ছিনতাইবাজকে সাক্ষী রাখার জন্যে। কিন্তু সে নিজেকে শান্ত করল। পদম বাহাদুরকে তার প্রতি পদে প্রয়োজন হবে। অনেক চেষ্টায় সে হাসির ভান করল। তারপর পকেট থেকে তার আইডেন্টিটি কার্ড বের করে পদমের সামনে মেলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ চোখ পাল্টে গেল পদমের। মাপ কিজিয়ে সাব। আমি বুঝতে পারিনি। আর কখনও এমন ভুল হবে না। বারংবার কথাগুলো বলে সে নিজের গালে নিজেই চড় মারল, সাহেব যে বড় অফিসার তা বুঝতে পারিসনি শালা, তুই আবার আদমি চিনে ছুরি তুলবি ?

ভাস্কর গম্ভীর গলায় বলল, ওটা আর কখনও যেন না হয়। আবার বলছি, এতদিন যা করেছিস সে-সব কথা একদম ভুলে যা।

ঠিক হ্যায় সাহেব। আর বলব না। বিনীত ভঙ্গীতে জানাল পদম।

খাওয়া দাওয়ার পর পদমের চেহারা পাল্টে গেল। সে বোধহয় জীবনে ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকে অত দামী খাবার খায়নি। ফুর্তিতে চটপটে গলায় জিজ্ঞাসা করল, এবার কি করতে হবে সাহেব?

নামচে বস্তিতে চল। রোস্টেড মুরগী কিনে একটা প্যাকেটে ভরল ভাস্কর।

হুকুমটা যে মোটেই পছন্দ হল না তা পদমের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। খানিকটা অনিচ্ছায় সে একবার ভাস্করের দিকে তাকিয়ে হাঁটা শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা শহরের ব্যস্ততা ছাড়িয়ে এল। রাস্তা বেশ নির্জন। গরীব পাহাড়ী মানুষেরা সাংসারিক কাজ করছে দুপাশের কাঠের বাড়িতে। ভাস্কর খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। নীল চোখের মেয়েটি তাকে প্রবল আকর্ষণ করছিল। সেই সঙ্গে জুলি শেরিংয়ের গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ানোর ভঙ্গী বুঝিয়ে দিয়েছিল সে ওই মেয়ের মা। জুলি কিছুতেই মেয়েকে বাড়ির বাইরে আসতে দেবে না। আর সেই নিষেধ শোনা মাত্র মেয়ের মুখে চোখে যে ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছিল তা থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে মা মেয়ের সম্পর্ক ভাল নয়। মেয়েটি কি মাকে বলবে একটা লোক গোপনে বাড়িতে ঢুকে লুকানো নব ঘুরিয়েছে? বলে দেওয়া, স্বাভাবিক। অবশ্য মায়ের প্রতি বিতৃষ্ণা যদি বেশী হয় তাহলে অন্য কথা। ভাস্কর নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না মেয়েটি জুলি শেরিংকে তার কথা জানাবে কিনা। জানালাটা সে ভাঙেনি। কায়দা করে ছিটকিনি খুলেছিল মাত্র। খুব সতর্ক চোখে পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না দাগটা। অবশ্য সেই প্রৌঢ় মানুষটি সাক্ষী দেবে ওই বাড়িতে আগন্তুক ঢুকেছিল। যারা নিজের বাড়ি বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ঘিরে রাখে বাইরের মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যে তারা অচেতন প্রৌঢ়টিকে আবিষ্কার করার পর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেই। হয়তো মেয়েটি বাধ্য হবে সমস্ত কথা বলতে। আবার সেটা নাও হতে পারে। ভাস্কর অনিশ্চয়তায় দুলছিল। শুধু বারংবার তার মনে পড়ছিল মেয়েটি যখন তার আঙুল স্পর্শ করেছিল তখন অদ্ভুত একটা সুখের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল শরীরে। কিন্তু তাকে দেখে মেয়েটি চিৎকার করেনি কেন? চোর বা ডাকাত বলে ভয় পায়নি কেন? শঙ্কিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শেষে একটু একটু করে সহজও তো হয়ে আসছিল। রহস্য উদ্ধার করতে পারছিল না ভাস্কর।

কতটা পথ হেঁটে এসেছে খেয়াল ছিল না, এখন মুখ ফিরিয়ে দেখল শহরটা অনেক ওপরে। পাহাড়ি পথে নামবার সময় দূরত্ব টের পাওয়া যায় না। এই সময় একটা বাঁকে দাঁড়িয়ে পদম আঙুল তুলে দেখাল, ওইটে হল নামচে বস্তি।

এদিকে জনবসতি বেশী নেই। অনেকটা ফাঁকা পাহাড় আর জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে বস্তিটাকে দেখা যাচ্ছে। পঁচিশ ত্রিশ ঘর বাসিন্দা সেখানে রয়েছে। অবশ্য রাস্তা

পিচের এবং পরিষ্কার।

দূরত্বটা অতিক্রম করতে বেশী সময় লাগল না। পদম এখন বেশ স্মার্ট হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলছে কম। কিন্তু সমানে শিষ দিয়ে চলেছে আগে আগে। বস্তিতে পেঁছে ভাস্কর বুঝল এদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। কর্মঠ মানুষ-জন তেমন চোখে পড়ল না। বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং শিশুরা ওদের অবাক চোখে দেখছিল। পদম মানুষগুলোকে একদম পাত্তা না দিয়ে শেষপ্রান্তে চলে এল। সেখানে বস্তি থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা কাঠের দোতলা জীর্ণ বাড়ি দাঁড়িয়ে। সেটার দিকে আঙুল তুলে পদম নীচু গলায় বলল, ওই বাড়িটায় বুড়ো থাকে। যাওয়ার আগে আর একবার ভাববেন সাহেব। তিব্বতী বুড়োটাকে মাঝে মাঝে শয়তান ভর করে। তখন ওর চোখের সামনে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নীরবে মাথা নাড়ল ভাস্কর। তারপর প্যাকেটটা হাতে ঝুলিয়ে সে এগিয়ে গেল কাঠের বাড়িটার দিকে। সে লক্ষ্য করল বস্তির বাচ্চা এবং বৃদ্ধারা বেশ দূরে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

কাঠের দোতলাটায় ঘর, নিচে শুধু গোটা আটেক বিম যার ওপর বাড়িটা দাঁড়িয়ে। জরাজীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরের বারান্দায় উঠে ভাস্কর ডাকল, কোই হ্যায়?

হুম্। একটা চাপা হুঙ্কারের মত আওয়াজ ভেসে এল দুটো ঘরের কোনো একটা থেকে। তারপর অদ্ভুত একটা বাজনা বেজে উঠল। ডুম ডুম ডুমাং, ডুম ডুম ডুমাং। এবং সেইসঙ্গে অদ্ভুত গলায় অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণের মত কিছু শব্দ। ভাস্কর মুখ ঘুরিয়ে দেখল পদম তো বটেই বস্তির উৎসুক দর্শকরা আওয়াজ হওয়া মাত্র ত্রস্তে অনেক দূরে সরে গেল। সামান্য ইতস্তত করে সে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে প্রথম ঘরটার দরজার সামনে দাঁড়াতেই একটা গর্জন ছিটকে এল। ব্যাপারটা এমন আচমকা যে ভাস্করের নিঃশ্বাস এক পলকের জন্যে থমকে গিয়ে-ছিল। ঘরের ভেতরটায় প্রায় অন্ধকার। খোলা দরজা দিয়ে যেটুকু আলো যাচ্ছে তাতেই মানুষটিকে দেখতে পেল। ওরকম তীব্র জ্বলন্ত চোখ এর আগে কখনও দেখেনি ভাস্কর। তিব্বতী পোশাক পরা এক বৃদ্ধ বাবু হয়ে বসে দু-তিন ফুট লম্বা তেল-চুকচুকে একটা কিছু নাচিয়ে যাচ্ছে সামনে। লোকটির মাথায় বিশ্রী ধরনের জটা। ভাস্কর একটু সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করল। তারপর হিন্দীতে বলল, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের সঞ্চালন থেমে গেল। লোকটি বলল, কি চাও?

কথা না বললে কি করে বোঝাব? ভাস্কর আর একটু এগিয়ে আসতেই লোকটি চিৎকার করে উঠল, তফাৎ যাও। নইলে তোমার মাথায় গোখরো ছোবল মারবে।

হকচকিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ভাস্কর। সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল লোকটা সশব্দে, সবাই ভয় পায়। হুঁ হুঁ বাবা, নাগকে ভয় পায় না এমন কোনো জীব পয়দা হয়নি। ওই যে দেখ অতবড় চেহারার জীব হাতি সে পর্যন্ত নাগকে চটায়

না। তুমি তো কোন ছার ?

ততক্ষণে ভাস্কর বুঝেছে গোখরোর ব্যাপারটা অভিনয় মাত্র। সে এবার খাবারের প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল, আপনার জন্যে এনেছিলাম।

কি আছে ওতে ?

দামী দোকানের খাবার।

দেখি। ছুঁড়ে দাও ওখান থেকে।

একটু বিরক্ত হয়ে প্যাকেটটা ছুঁড়তেই লুফে নিল লোকটা। তারপর তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলে মুরগীর ঠ্যাং বের করে শিশুর মত হাসল। ভাস্কর দেখল লোকটি ডানহাতে ঠ্যাংটা ধরে হার্ঘরের মত চিবিয়ে খাচ্ছে। যেন কোনো কালে সে এইসব খাবার খায়নি বা অনেকদিন হয়তো একেবারেই অভুক্ত আছে।

খাওয়া শেষ হলে লোকটা তৃপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই ?

ভেতরে আসব ?

আসতে পার। তবে হ্যাঁ,, আমাকে ঘুষ দিয়ে যে কাজ হাসিল করবে সেটি হচ্ছে না। আমি সহজে ভুলি না। লোকটি মাথা নাড়ল।

সতর্ক ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল ভাস্কর। আশেপাশে সাপের কোন চিহ্ন নেই। মাথার ওপর একটা ঝুলজমা সিলিং। একটা ভাঙা টুল দেখতে পেয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে বসল ভাস্কর।

মতলব কি ?

আমার যে মতলব আছে তা জানলেন কি করে ?

এখানে তো মতলব ছাড়া কেউ আসে না। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সাপের বিষ চাই, মানুষ মারার জন্যে বিষ চাই, নেশা করার জন্যে সাপের কৌটো দরকার— হাজির হও এখানে। সব শালা ধান্দাবাজ। তোমার ধান্দাটা কি বলে ফেল ! লোকটা তার আলখাল্লার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তেল চুকচুকে সত্যিকারের সাপ বের করে এনে আদর করতে লাগল।

আপনি সাপের বিষ চেনেন ?

এ্যাঁ ? তুমি কোনো মাকে জিজ্ঞাসা করেছ বুকের দুধ দেখেছে কিনা ! কি আজব বাৎ। আমি বিষ চিনব না কি তুমি চিনবে ? তোমার কি চাই ?

ভাস্কর হাসল, আপনিই বলুন তো কি চাই ?

হঠাৎ প্রচণ্ড খেপে গেল লোকটা, আমাকে মুরগী খাইয়ে কিনে নিয়েছ ? খেলা হচ্ছে আমার সঙ্গে ? কথা শেষ করে শিষ দিল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের সাপটা তড়াক করে খাড়া হয়ে ফণা তুলল। যদিও ভাস্কর বেশ দূরত্বে বসেছিল তবু তার শরীরে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, ধান্দাটা কি সত্যি করে বল। নইলে ও তোমাকে ছাড়বে না।

ওটাকে শান্ত হতে বলুন আগে নইলে কথা বলা যাবে না।

মানে ?

আমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারবেন না।

লোকটা এবার অদ্ভুত চোখে ভাস্করকে দেখল। তারপর ঠোঁটে একটা শব্দ করেই সাপটা গুটিয়ে এল। সেটাকে আবার তুলে নিয়ে লোকটা বলল, সাবাস! হিম্মতবাজ মানুষের সঙ্গে কথা বলার আরাম আছে। এখানে যারা আসে তাদের মধ্যে জুলি ছাড়া আর কারও এমন হিম্মত নেই।

নাড়া খেল ভাস্কর। বাঃ, চমৎকার!

সে নীচু গলায় বলল, ছোট সাপ রাখেন?

ছোট সাপ?

ছোবল খাওয়ার সাপ?

তুমি তো নেশা কর না।

কি করে বুঝলেন?

তোমাকে দেখে।

অন্যের জন্যে দরকার।

যার দরকার তাকেই আসতে বল।

আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই। মিস্টার শেরিংকে চিনতেন? যার মদের দোকান ছিল?

বুড়ো শেরিং? হ্যাঁ, লোকটা নেশা করতো বটে। তারপর হঠাৎ সুর পাল্টে জিজ্ঞাসা করল, তার কথা তুমি জানলে কি করে? তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল?

হ্যাঁ বুড়ো শেরিং আপনার কথা বলেছিল আমাকে। মদ খেলে আমার নেশা হয় না. বমি হয়ে যায়। বুড়ো বলেছিল তাই আপনার কাছে আসতে। মিথ্যে কথা বলতে গলা কাঁপল না ভাস্করের।

লোকটা মাথা নাড়ল। তারপর উঠে দাঁড়াতে আরও দুটো সাপ ওর শরীর থেকে নেমে আসনের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল। লোকটা এতক্ষণ সাপের সঙ্গে বাস করছিল? পাশের দরজা খুলে লোকটা ভাস্করকে ডাকল। ভাস্কর কাছে যেতেই বলল, ওই ঘরে তিরিশটা কালনাগিনী ছিল এক সময়। এখন মাত্র পাঁচটা আছে। আর কৌটোয় ধরা সাপ আছে পনেরোটা। ওগুলো আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। লোকেরা নিজেদের ধান্দায় আমার কাছে এসে কিনে নিয়ে যায়। তুমি যখন বুড়ো শেরিংয়ের বন্ধু তখন তোমায় বলি বুড়ো লোকটা ভাল ছিল। অন্তত আমার কাছে। অনেক টাকা খেয়েছি ওর কাছে সাপ বিক্রী করে।

ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে ভাস্কর বলল, জুলি শেরিং কি রোজ আপনার কাছে আসে?

রোজ? রোজ কেউ আমার কাছে আসে না। জুলিকে পাঠিয়েছিল বুড়ো শেরিং। দুবার এসেছিল সে। বুড়ো বলত ছোবলে তার কাজ হয় না। তাই ইঞ্জেকশন দিয়ে বিষ ঢোকানোর কথা বলত হাতের শিরায়। আমি রাজি হতাম না। এসব কথা তোমাকে আমি বলছি কেন? হঠাৎ সচেতন হল বৃদ্ধ। তারপর সন্দেহের

চোখে তাকাল।

ততক্ষণে পকেট থেকে কাঠের বাক্স বের করে শিশিটা সামনে ধরেছে ভাস্কর, এটা কোন্ সাপের বিষ ?

দেখি ? চকচক করে উঠল লোকটার চোখ।

ভাস্কর একটু দোনামনা করল। তারপর শিশিটা বৃদ্ধ লোকটার হাতে তুলে দিল। লোকটা চোখের সামনে শিশিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর বলল, এটা কোন সাপের বিষ নয়।

চমকে উঠল ভাস্কর, কি বলছেন ? ঠিক করে বলুন ?

লোকটা মাথা নাড়ল, আমাকে বিষ চিনিও না। আমি এই শিশিটাকে চিনি। এতে করেই কেউটের বিষ নিয়ে গিয়েছিল জুলি শেরিং। কিন্তু এখন এতে যা আছে তা সাপের বিষ নয় ! বলতে বলতে ছিপি খুলে সাবধানে ঘ্রাণ নিল লোকটা। তারপর দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, না কক্ষণো না। এ সাপের বিষ নয়, ওষুধ। শিশিটা বন্ধ করে ছুঁড়ে দিল লোকটা ভাস্করের হাতে। লুফে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, যে রোজ সাপের ছোবল খায় তাকে কেউটে কামড়ালে মরবে ?

মাথা নাড়ল বুড়ো, একদিন অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে। হয়তো দুদিন। কিন্তু রোজ যার শরীরে বিষ ঢুকছে তার কলজে শক্ত হয়ে যায়।

পার্স খুলে দশটা টাকা বের করল ভাস্কর। তারপর বলল, অনেক ধন্যবাদ। যদি কখনও দরকার হয় আবার দেখা হবে।

টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে সে বেরিয়ে এল বাইরে।

ভাস্করকে স্বচ্ছন্দে হেঁটে আসতে দেখে পদম বাহাদুর এগিয়ে এল, তিনশো টাকা দাম নিল সাহেব ?

তিনশো ?

ওই যে কৌটোর সাপ কিনতে গেলেন তার দাম।

আমি সাপ কিনিনি পদম। কারণ আমার ওই নেশা নেই।

কথাটা শুনে হকচকিয়ে গেল ছেলেটা। সাহেব এসেছিল সাপ কিনতে ছোবল খেয়ে নেশা করবে বলে। যাওয়ার সময় বলছে সেই নেশা নেই। সে ভাস্করের পাশে হাঁটতে হাঁটতে উশখুশ করছিল। সাহেবকে এখন তার আরও রহস্যময় লাগছে। তবে সে এটুকু বুঝতে পেরেছে এই মানুষটি বেশ ক্ষমতাবান। এর সঙ্গে লেগে থাকলে আখেরে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। লোকটার গায়ে যে শক্তি আছে এতে তার নিজের কোনো সন্দেহ নেই। সঙ্গে আবার ছবিওয়ালা কার্ড আছে যা একমাত্র পুলিসদের থাকে। বড় বড় পুলিসদের। পদম সেটা শুনেছে।

দুপুরে স্নান করে মিনিট তিরিশ শুয়েছিল ভাস্কর। বুড়ো শেরিং সাপের ছোবলের নেশা করত। তাতে তার তৃপ্তি হত না। সে ইঞ্জেকশনে সাপের বিষ ভরে নেশা শুরু করেছিল। এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল বউ জুলিকে সেটা বুড়ো তিব্বতীর

কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনতে। জুলি দুবার গিয়েছে, বুড়োর কথায় জানা গেল। ধরা যাক, প্রথমবার সে ঠিক বিষ এনেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিষ এনে তার জায়গায় যে জিনিসটা শিশিতে ঢেলেছিল সেটা জানতে আর কয়েক ঘণ্টা লাগবে। শহরে ফিরে ভাস্কর একটা ল্যাবরেটরীতে জমা দিয়ে এসেছে সেটাকে পরীক্ষার জন্যে নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে। যদি ওই জিনিসের কিছু পরিমাণ বুড়ো শেরিংয়ের শরীরে কোনো ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গিয়ে থাকে তাহলে ব্যাপারটায় কোনো অন্ধকার থাকে না।

সকালের ব্রেকফাস্ট বেশ ভারি হয়ে যাওয়ায় মনে হয়েছিল দুপুরের খাওয়ার তেমন দরকার হবে না। কিন্তু এতটা পথ ওঠানামা করার পর এখন বেশ খিদে পাচ্ছে। কাল এখানে আসার পর থেকে সে লোকাল অফিসের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। ওদের না জানিয়ে যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় ততটাই ভাল। কারণ জুলি শেরিংকে সাহায্য করতে ওখানে কেউ নিবেদিত প্রাণ হয়ে আছে কিনা কে জানে। কিন্তু আজ না হোক, আগামী কালই একবার যাওয়া উচিত। হেড-অফিসকে সে বলেনি এতটা গোপনে কাজ করবে। কে জানতো, জুলি শেরিং বাড়ির চারপাশে ইলেকট্রিক তার ছড়িয়ে রাখে। ব্যাপারটা কি করে পুলিসের অনুমতি পেল তাই বিস্ময়ের।

ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করবে সে অনিল মিত্রকে। অনিল এই শহরের পুলিসের বড়কর্তা। একসময়ে ওরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। ভাস্কর ভেবেছিল তার উপস্থিতির কথা অনিলকেও জানাবে না। কিন্তু ল্যাবরেটরী যদি রিপোর্ট দেয় ওই শিশির ওষুধ গোলমেলে তাহলে হয়তো প্রয়োজন হবে।

এছাড়া আর একটি ব্যাপার ঘটেছে। তার অনুপস্থিতিতে কেউ এই ঘরে ঢুকেছিল। তার সুটকেশ হাতড়েছে কেউ। ইচ্ছে করেই সে ওটায় চাবি দিয়ে যায়নি। টাকা পয়সা বা অন্য দরকারী জিনিস সে চিরকাল সঙ্গেই রাখে। অতএব অনুসন্ধানকারী কোনো কিছুর তল্লাশ পায়নি। কিন্তু প্রশ্নটা হল, কে এসেছিল? জুলি শেরিংয়ের পক্ষে কিছুতেই জানা সম্ভব নয় তার অস্তিত্বের কথা। তাহলে?

এই সময় দরজায় শব্দ হল। ভাস্কর সতর্ক হয়ে উঠে দরজা খুলে দিতেই শাজাহানবাবুকে দেখতে পেল। নেশায় চুর হয়ে আছেন ভদ্রলোক। দুটো পা স্থির থাকছে না। তাঁকে দেখে বললেন, সরি, আবার নম্বর ভুল করে ফেলেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না ভাই।

আপনি খুব বেশি নেশা করেছেন।

করতাম না। আপনি বললেন থেকে যেতে। আমি দেখলাম যখন চান্স পাওয়া গেল তখন মনের সুখে খেয়ে নিই। কলকাতায় গেলে তো আর মদ খেতে পাব না স্ত্রীর জ্বালায়। হাসতে চেষ্টা করেন ভদ্রলোক। ভাস্কর ওর হাত ধরল, চলুন আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। বাধ্য ছেলের মত শাজাহান ওর সঙ্গে

হেঁটে এল। দরজা বন্ধ ছিল। ভাস্কর কয়েকবার আওয়াজ করার পর প্রৌঢ় এবং স্থূলকায় এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন। তাঁর চুলগুলো ঘাড় অবধি নেমেছে। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। বেশ দুধে ঘিয়ে মানুষ তা এক নজরেই বোঝা যায়। কপালে সিঁদুরের টিপ কিন্তু শরীরে ফিনফিনে পাঞ্জাবির ওপর শাল আর লুঙ্গি করে পরা সিল্কের একটা কাপড়।

শাজাহান সেই অবস্থায় বললেন, গুরুদেব। খুব বড় তান্ত্রিক।

আইচ্ছা! আয়েন, ঘরে আয়েন। আপনার কথা এঁর লগে অনেক শুনছি। উদার গলায় আহ্বান জানালেন ভদ্রলোক।

ঘরে ঢুকে শাজাহান নিজের বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। এবং তখনই ভাস্করের চোখে পড়ল একজন মধ্যবয়সী সুদর্শনা মহিলা সামান্য আড়ষ্ট ভঙ্গীতে চেয়ারে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। গুরুদেব ডাকলেন, ঘরে আয়েন, একটু আলাপ করি।

ভাস্কর এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসল। ভদ্রলোকের পাশ ঘেঁষে হাঁটার সময় সে বিলিতি সুবাস পেয়েছে। মানুষটি সৌখিন সেটা বোঝা যাচ্ছে। বিছানায় পড়ামাত্র কোনো মানুষের নাক ডাকে শাজাহানকে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। সেদিকে তাকিয়ে গুরুদেব বললেন, নন-ডিস্টার্বিং এলিমেণ্ট! আপনার নিশ্চয়ই মনে হয় কেন আমি সিঙ্গল রুম না নিয়ে এর সঙ্গে শেয়ার করে আছি! তার কারণ আমার অনেকটা স্পেস চাই। সিঙ্গল রুম বড্ড ছোট। আর অন্য হোটেলে গেলে বাঙালীদের উপদ্রব বেশি। আমি একটু সাধনা করি, শিষ্য-শিষ্যারা আসে। ওরা অবশ্য আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমি মশাই কোন গৃহীর কাছে থাকতে চাই না।

আচমকা ছিমছাম বাংলায় কথা বলা শুরু করলেন গুরুদেব। প্রাথমিক পূর্ব-বঙ্গীয় টান উধাও হয়ে গেল। আমার ঘরে কি খুঁজতে গিয়েছিলেন? আচমকা প্রশ্ন করল ভাস্কর।

আপনার আইডেণ্টিটি। নির্বিকার মুখে জানালেন গুরুদেব।

এতটা আশা করেনি ভাস্কর। লোকটি অত্যন্ত ঘোড়েল কিংবা শয়তান।

আপনি নিশ্চয়ই বলবেন আপনার অনুপস্থিতিতে কাজটা করা অন্যায়। একশোবার অন্যায়। কিন্তু পাশের ঘরে একজন বাঙালী টিকটিকি বাস করলে সেটা কার ভাল লাগে মশাই।

আপনার ব্যবসা কি?

সেটা নাই জানলেন। কারণ আপনি তো আমার উদ্দেশ্যে আসেননি।

আমি কি উদ্দেশ্যে এসেছি সেটা আপনি জানেন?

ঠিকঠাক জানি না। তবে আপনি যখন একটা মদের দোকানে ঢুকে মদ না খেয়ে বেরিয়ে আসেন এবং সেই দোকানের মালিকের বাড়িতে চোরের মত ঢোকেন তখন এটা পরিষ্কার যে আমার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। বিগলিত

হাসলেন গুরুদেব।

তীব্র চোখে তাকাল ভাস্কর, আপনি কে?

আমি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তবে হ্যাঁ, আপনার ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা অন্যায় হয়ে গেল এজন্যে আবার দুঃখ প্রকাশ করছি। এখন বলুন তো আমি আপনার কি সেবা করতে পারি? গুরুদেব ফিরে গেলেন নিজের আসনে। তারপর গ্যাঁট হয়ে বসলেন।

সেবা?

অতিথি নারায়ণ, তার সেবা করব না?

ভাস্কর লোকটির চোখের দিকে তাকাচ্ছিল না। একটা লোক তার ঘরে ঢুকেছিল চোরের মত জানতে পেরেও সে উত্তেজিত হচ্ছে না। লোকটার নিশ্চয়ই কিছু ক্ষমতা আছে। এবং ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললে সেই ক্ষমতায় আক্রান্ত হতে হয়। সে মহিলার দিকে তাকাল। সেই থেকে ভদ্রমহিলা একই ভঙ্গিতে বসে আছেন। এবং তখনই মনে হল উনি ঠিক চেতনায় নেই। সে বলল, আপনাকে আমি বুঝেছি। আপনার ব্যবসাটাও।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন না কেন?

আমি নির্বোধ নই বলে।

হুম্।

যদিও আপনি জানেন আমি আপনার উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি কিন্তু মানুষকে সম্মোহিত করে আপনার কি লাভ সেটা জানতে পারি?

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর গুরুদেব বললেন, নাঃ আপনি বুদ্ধিমান। আর বুদ্ধিমানের সঙ্গে মিত্রতা করতে আমি ভালবাসি। তবে শুনুন। আমি আজ পর্যন্ত কোন মানুষের ক্ষতি করিনি। তবে অত্যন্ত প্রয়োজনে চাপ দিয়ে টাকা নিই যাতে একটু ভালভাবে থাকতে পারি। টাকা নিই তারই কাছে যার সেটা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে! আচ্ছা, আপনাকে একটা উদাহরণ দেখাই—। বলতে বলতে গুরুদেব উঠে মহিলার সামনে বসলেন, কমলাদেবী, আপনি খুব ভদ্রমহিলা, আপনার স্বামী কি আপনাতে আসক্ত?

মহিলা খুব ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, আগে ছিল, এখন না।

ওঁর ব্ল্যাক মানি আছে?

অনেক। মহিলা জবাব দিলেন যেন বহুদূর থেকে স্বর ভেসে এল। এবার গুরুদেব ভাস্করের দিকে তাকিয়ে হেসে নিজের আসনে ফিরে গিয়ে বললেন, এখন ইচ্ছে করলে আমি ওঁর কাছ থেকে অনেক গোপন তথ্য জেনে নিতে পারি যা পরে আমার টাকা উপায়ে সাহায্য করবে। কোন পুলিসের বাপের সাধ্য নেই আমাকে ধরে। আসলে আমি প্রকাশ্যে কোনো ক্রাইম করছি না। তাই না? গুরুদেব মধুর হাসলেন, আমার এখানে শিষ্যারা আসে বলে হোটেলের মালিকানের কোনো আপত্তি নেই কেন তা বুঝলেন? এখন এই অবস্থায় যদি শুনি পাশের ঘরে এমন

কেউ এসেছে যার গতিবিধি সন্দেহজনক তাহলে অস্বস্তি হয় কি না বলুন ? তাই মন স্থির করতে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলাম আপনার জিনিসপত্র। আগেই ক্ষমা চেয়েছি, আবার চাইছি। এবার আপনি আসুন কারণ ভদ্রমহিলার চেতনা ফিরে আসার সময় হয়েছে। আমি দশ-বারো মিনিটের বেশী আচ্ছন্ন রাখতে পারি না কাউকে।

ভাস্কর উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনি চালিয়ে যান। আপনার কোনো অপরাধ যদি আমার চোখে প্রমাণ সমেত ধরা না পড়ে তাহলে তাতে আমার আপাতত কোনো মাথা ব্যথা নেই। তবে প্রয়োজনে হয়তো আপনাকে আমার দরকার হতে পারে। সেই সময় কি সাহায্য পেতে পারি ?

আবার বিগলিত হলেন গুরুদেব, অবশ্যই। আমি আর আটচল্লিশ ঘণ্টা এখানে আছি। তার মধ্যে প্রয়োজন হলে জানাবেন।

BANGLAPDF.NET

তৃপ্তি করে দুপুরের খাওয়া যখন শেষ করল ভাস্কর তখন এই পাহাড়ি শহরে রোদ নেই, আকাশে হালকা মেঘ উড়ছে এবং ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘরে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সে সোজা ল্যাবরেটরীতে চলে এল।

রিপোর্ট দেখে চমকে উঠল সে। বৃদ্ধ সাপুড়ের কথাই ঠিক। ওটা কোনো সাপের বিষ নয়। তীব্র দুটো অ্যাসিড মিশিয়ে রাখা হয়েছে শিশিতে। সেটা ধমনীতে প্রবেশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। এই মিশ্রণের সঙ্গে শঙ্খচূড়ের বিষের খুব সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে। শরীরে বেশীক্ষণ থাকলে পোস্টমর্টেমে দুটোকে গুলিয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে এ্যাসিড এবং সাপের বিষের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তা বিশেষজ্ঞ মাত্রেরই চোখে পড়বে। কিন্তু এখানে যে একটা কৌশল ছিল তা পরিষ্কার।

রাস্তায় নেমে মন স্থির করতে দুদণ্ড সময় নিল ভাস্কর। মিস্টার শেরিংয়ের শরীরে যদি এই বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ওই সিরিঞ্জ এবং শিশিটি কেন নষ্ট করে ফেলা হল না ? কেন সেটা সঞ্চয় করে রাখলেন বাড়ির মালিকান ? কেউ কি নিজের অপরাধ প্রমাণ করার ব্যবস্থা জিইয়ে রাখে ? হঠাৎ ভাস্করের মাথায় আর একটা প্রশ্ন ঢুকল। ওই সিরিঞ্জেই কি এই শিশির মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছিল ? এটা জানতে পারা অবশ্য এমন কিছু অসুবিধের নয় যদি না খুব সুপটু হাতে ওটাকে বিশুদ্ধ করা হয় !

কাঁধ ঝাঁকালো ভাস্কর। অনেক হয়েছে। এর মধ্যে সে এই সত্যে পৌঁছেছে যে মিস্টার শেরিং প্রচণ্ড নেশা করতেন। মদ-গাঁজায় তাঁর শানাতো না বলে ছোট

সাপের ছোবল নিতেন। শেষ দিকে তাতেও আরাম না হওয়ায় সাপের বিষ ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীরে নেওয়া শুরু করেন। এই সুযোগটিকে কাজে লাগালো কেউ। সাপের বিষের বদলে অ্যাসিডের মিশ্রণ দেওয়া হয়েছিল মিস্টার শেরিংকে। কি স্বার্থ ছিল তার। বুড়ো সাপুড়ের কথা অনুযায়ী জুলি শেরিং দুবার সাপের বিষ আনতে গিয়েছিল। সহজ ধারণায় জুলিকেই এর জন্যে দায়ী করা উচিত। এবং সেটার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। দুজনের বয়সের পার্থক্য তো ছিলই, হয়তো অবৈধ প্রেমও এটা করতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া বৈদ্যুতিক তারের বেড়া, স্বাস্থ্যবান প্রহরী, মেয়েকে লুকিয়ে রাখার ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে ভদ্রমহিলা সোজা চরিত্রের মানুষ নন।

কিন্তু তাহলে জুলি শেরিং এই বস্তুগুলো কেন রেখে দেবে বাড়িতে? আর ওই মোটরবাইক চালিয়ে ছোকরাটাই বা কে? সে-ইকি জুলির প্রেমিক? এত সহজে সব কিছুর সমাধান হয়ে যাচ্ছে, মন মানতে চাইছিল না। সে হাতঘড়ি দেখল। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গুরুদেবটির সেই মানচিত্র আঁকা দেওয়ালের সামনে আসার কথা। লোকটা অপরাধ করেছে ঠিকই কিন্তু এমন অপরাধ তার আওতার মধ্যে পড়ে না। সম্মোহন করে দোষের কথা জেনে নিয়ে পরে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করা অবশ্যই আদালত ক্ষমা করবে না কিন্তু আপাতত তার এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। সে পুলিসে চাকরি করে না। তাকে যা করতে বলা হয়েছে সেটা করতে এসেই একেবারে সমুদ্রের মাঝখানে ডুব দিয়ে ফেলেছে। আগে এটা সমাধান হোক।

যদিও গুরুদেব কথা দিয়েছিলেন কিন্তু ভাস্করের সন্দেহ ছিল পরিচয় প্রকাশিত হবার পর ভদ্রলোক হাওয়া হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ঠিক সময়ে ওঁকে হাজির হতে দেখে ভাল লাগল তার। পাঁচ ফুটের মধ্যে থাকলে সে কখনই লোকটার চোখের দিকে তাকাবে না বলে ঠিক করেছে। মুখোমুখি হতেই গুরুদেব বললেন, বলুন, আপনার কোন সেবায় আমি লাগতে পারি?

ভাস্কর উদাস চোখে হাসল। তারপর বলল, আপনি তো একটার পর একটা অপরাধ করে যাচ্ছেন। আজ একটা ভাল কাজ করুন।

কি কাজ? গুরুদেবের গলার স্বর বেশ চিন্তিত।

এই শহরের সমস্ত মহিলাকে আপনি চেনেন?

ওই যাঃ! এমন কথা বললেন, যেন আমি—! না মশাই, তা চিনি না।

জুলি শেরিং বলে কাউকে চেনেন?

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন গুরুদেব। তারপর বললেন, উঁহু। আমি আছি টিবেটিয়ান হোটেলে। শেরিং যখন তখন মনে ইচ্ছে টিবেটিয়ান। ওই লাইনে নেই। আমার সব শিষ্যা বাঙালি, মারোয়াড়ী।

ভালই হল! আপনি আমার সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার বাড়িতে যাবেন। ধরে নিন আপনি শুনেছেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর জুলি ওই বাড়ি বিক্রী করবে।

আপনি ওখানে একটা আশ্রম খুলতে চান। তাই দরাদরি করতে এসেছেন। আর আমি আপনার শিষ্য, সঙ্গে এসেছি।

যাচ্চলে? খামোকা মিথ্যে বলতে যাব কেন?

একটা ভাল কাজ করতে। আমি দেখতে চাই আপনার সম্মোহনের ক্ষমতা কতটুকু! এই একটি কাজ করলে আপনার সঙ্গে সন্ধি হতে পারে। বেশী কিছু জানতে চাইবেন না। শুধু আমার প্রশংসা করে যাবেন।

সম্মোহন করার পর কি করতে হবে।

আপনি চলে আসবেন। আর দ্বিতীয়বার যাবেন না। মেয়েটি খুব মারাত্মক। সমস্ত বাড়ি ইলেকট্রিক তারে ঘিরে রাখে। এবং আটচল্লিশ ঘণ্টা নয়, আগামীকালই এই শহর থেকে চলে যাবেন কারণ জুলির কর্মচারীরা মারাত্মক।

কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর প্রায় নিমরাজী হয়ে গুরুদেব সঙ্গী হলেন। ভাস্করকে আর একবার তার পরিচয়পত্র দেখাতে হয়েছিল। ভদ্রলোক যতই তড়পান না কেন ভাস্কর বুঝতে পারছিল তাকে দেখার পর ওর মনে একটা ভয় কাজ করছে।

ক্লিন হার্ট রোডে এখন বেশ লোক চলাচল করছে। দিনটা এখনও মরে যায়নি বটে তবে পৃথিবীতে আর রোদ নেই। গুরুদেব কয়েকবার ওর চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ভাস্কর সেই সুযোগ দেয়নি। নির্দিষ্ট বাড়িটির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না জুলি শেরিং আছে কিনা। আজকের ঘটনার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাও তো জানা নেই। হুট করে ঢুকে গেলে বৈদ্যুতিক তারটা খুঁজতে হবে। কাল রাত্রে সে যখন ঢুকেছিল তখন যদি তারে বিদ্যুৎ থাকত তাহলেই হয়ে গিয়েছিল। এটা থেকে বোঝা গেছে জুলি বাড়িতে থাকলে তারটা নিষ্ক্রিয় থাকে।

গুরুদেবকে সাবধানে পা ফেলতে বলে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ভাস্কর। সেই চটপটে লোকটাকে এখন বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে। ঠিক যেখানটায় জুলির গাড়ি থেমেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে ডাকল, কেউ আছেন? বাড়িতে কেউ আছেন?

নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। ভাস্কর সবিস্ময়ে দেখল জুলি দাঁড়িয়ে আছে দরজার মাঝখানে, ছবির মত। অভিব্যক্তিতে কিছুটা বিস্ময়, অনেকটাই বিরক্তি। স্পষ্ট ইংরেজীতে উচ্চারণ করল, কি চাই?

ভাস্কর বলল, নমস্কার, আমার গুরুদেব আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

গুরুদেব? এবার জুলির বিস্ময় যেন বেড়ে গেল।

উনি পৃথিবী-বিখ্যাত যোগী আনন্দস্বামী। এই শহরে একটা যোগাশ্রম খুলতে চান। সেই ব্যাপারেই—আপনি ওঁর নাম শোনেননি? যতটা সম্ভব অভিনয় করার চেষ্টা করল ভাস্কর। যদিও কপালের টিপ ছাড়া গুরুদেবকে মোটেই যোগী বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য যোগীরা টিপ পরে কিনা সেটাও তার জানা নেই।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল জুলি শেরিং। তারপর খানিকটা নিরাসক্ত গলায় বলল, যদিও যোগীদের সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই তবু আপনারা খানিকক্ষণ বসতে পারেন।

সতর্ক পায়ে প্রথমে হেঁটে গেল ভাস্কর। না পায়ে কোন বিদ্যুতের স্পর্শ নেই। ওকে দরজার কাছে পৌঁছতে দেখে হাঁটা শুরু করলেন গুরুদেব।

জুলি শেরিং ততক্ষণে ঘরে ঢুকে আলো জেবলেছে। এখন বাইরে ঠাণ্ডা বাড়ছে। তা সত্ত্বেও জুলির শরীরে এখন লাল রঙের ম্যাক্সি যার কোমর চাপা। মহিলার বয়স আন্দাজ করা মুশকিল কিন্তু যৌবন যে অচল তা বুঝিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছে। ধবধবে সাদা সোফায় এমন ভঙ্গিতে বসল ভাস্কর যাতে গুরুদেব এবং জুলি মুখোমুখি বসতে পারে। জুলি শেরিং যে তাকে দেখছে সেটা বুঝতে পেরে ভাস্কর সরল ভাবভঙ্গী করার চেষ্টা করল। গুরুদেব বসলেন। জুলি ঘরের কোণে একটা বুদ্ধমূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কি চাই বলুন।

ভাস্কর দেখল গুরুদেব নিচের কার্পেট দেখছেন। যদিও জুলি যে দূরত্বে দাঁড়িয়ে সেটা সম্মোহনের সীমায় নয় কিন্তু ওকে এত লাজুক দেখাচ্ছে কেন? সে বলল, আমরা খবর পেয়েছি আপনি আপনার স্বামীর মৃত্যুর পর এই বাড়ি বিক্রি করে দিতে চান। গুরুদেবের ইচ্ছে এইটে কিনে নিয়ে যোগ-সেণ্টার খোলেন।

কে খবর দিল? খুব শীতল গলা জুলি শেরিংয়ের।

একজন দালাল।

আমি কোনো দালালকে চিনি না। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। আপনাদের আর কিছু জানা বা বলার আছে?

ভাস্কর বিপাকে পড়ল। সে গুরুদেবকে বলল, গুরুদেব, আপনি কিছু বলুন। উনি বলছেন দালাল আমাদের ভুল সংবাদ দিয়েছে।

গুরুদেব মুখ তুললেন। তারপর উল্টোদিকের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, ওই বুদ্ধমূর্তি কোত্থেকে এনেছেন?

আমি জানি না। কারণ এটা শেরিং পরিবারে কয়েক বছর ধরে আছে।

খুব জীবন্ত। খু-উ-ব। গুরুদেব অন্যদিকে দৃষ্টি রাখছিলেন।

এটা বিক্রীর জন্য নয়। এনি থিং মোর?

নাঃ। গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন।

ভাস্কর বিপাকে পড়ল। যে জন্যে লোকটাকে সঙ্গে আনা তা কাজেই লাগল না। ওরকম চটপটে লোকটার পরিবর্তনের কারণ ধরতে পারছে না সে। তবু কথা বানানোর জন্যে বলল, আমাদের গুরুদেব অতীত এবং ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। আপনার যদি তেমন কিছু জানার আগ্রহ থাকে—।

তাই নাকি! অদ্ভুত হাসি খেলে গেল জুলির মুখে, আমার ওসবে মোটেই বিশ্বাস নেই, আমি বর্তমান নিয়েই ভাবি।

ভাস্কর ইতস্তত করল। তারপর বলল, এখানে মানে আপনার বাড়ির গেট পেরিয়েই গুরুদেব বলছিলেন এই মহিলা খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। তাই আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।

মহিলা একটুও না নড়ে কাঁধ ঝাঁকালেন। ভাস্কর দেখল গুরুদেব একবারও মহিলার দিকে তাকাচ্ছেন না। তার খুব রাগ হচ্ছিল। লোকটা নির্ঘাৎ তাকেও ভাঁওতা দিয়েছে। ওসব সম্মোহন-টম্মোহন বাজে কথা। স্রেফ ফোর টুয়েন্টি। এই বাড়ি থেকে একবার বেরিয়ে গেলে আবার ঢোকা মুস্কিল হবে। কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায়!

পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বড় রাস্তায় উঠেই গুরুদেব হাত জোড় করলেন, মাপ করুন ভাই। আমি হেরে গেলাম।

হেরে গেলেন মানে?

মানে, যেই ওই মেয়েছেলেটার দিকে তাকাতে গিয়েছি অমনি চোখ পড়ে গেছে বুদ্ধদেবের চোখে। মাইরি কি বলব, বুদ্ধদেবের চোখে এমন জ্যোতি যে আমার সব শক্তি ভোঁতা হয়ে গেল। মেয়েছেলেটা নড়ছিল না ওখান থেকে যে বুদ্ধদেবকে এড়িয়ে সম্মোহিত করব। আপনাকেও বলতে পারছি না ব্যাপারটা। তবে হ্যাঁ, খানদানী চীজ। একে ক্লায়েন্ট করতে পারলে মোটা টাকা কামানো যাবে। তবে হ্যাঁ, ওই বুদ্ধমূর্তি—। খুব আফসোসের গলায় বললেন গুরুদেব। ব্যাপারটাকে একদম উড়িয়ে দিতে পারল না ভাস্কর। এ গল্প তো জানা, ক্রুশ সামনে থাকলে ড্রাকুলারা পালিয়ে যায়। এটাও সেরকম হতে পারে তো।

ঠিক সেই সময় মোটরবাইকটাকে উঠে আসতে দেখল সে। ছেলেটা একটা চামড়ার জ্যাকেট গায়ে চাপিয়েছে। ভাস্কর গুরুদেবকে বলল, এটাকে বধ করুন তো। বলেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল। বাঁক ঘুরে এসে ছেলেটি এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল, কি চাই? সে তখন স্পিড কমিয়েছে মাত্র, চলা থামায়নি।

আপনার জন্যে জরুরী খবর আছে।

এবার অনেকটা হতভম্ব হয়ে ছেলেটি ইঞ্জিন বন্ধ করল, কে আপনারা? কি খবর? কে দিয়েছে?

গুরুদেব বললেন, একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন! উত্তর দিচ্ছি। আমার দিকে তাকাও। হ্যাঁ, চমৎকার। এই রকম চোখাচোখি। বাঃ, উত্তর পাচ্ছ? তিন-তিনটে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছ?

ভাস্কর অবাক হয়ে দেখল ছেলেটি সুবোধ বালকের মত ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

বাঃ! কি নাম তোমার?

এ. কে. প্রধান।

কি কাজ করো?

এখানকার ইন্সুরেন্স অফিসের ইনচার্জ।

বাঃ ! কোনো দুশ্চিন্তা আছে ?

হ্যাঁ। হেড অফিস যদি জুলিদের কেসটা এ্যাপ্রুভ না করে তাহলে ও আমাকে বিয়ে করবে না। আমি বিপদে পড়ে যাব। ছেলেটা স্মৃতির মত দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। ভাস্কর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ম্যাজিক অনেক দেখেছে সে, কিন্তু এমন দ্যাখেনি। সে অন্যদিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, ওর এই অবস্থা কতক্ষণ থাকবে ? আপনার কোনো ডোজ আছে ?

তা আছে। এর ক্ষেত্রে অন্তত এক ঘণ্টা।

তাহলে আপনি কেটে পড়ুন।

অ্যাঁ !

যা বলছি শুনুন।

না মানে এর কাছ থেকে অনেক মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।

সেটা আপনার দরকারে লাগবে না। আমি প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে ? জিজ্ঞাসা করেই সে ছেলেটির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ল, কত বছর চাকরি হয়েছে তোমার ?

বারো বছর। তেমনি পুতুলের মত উত্তর দিল ছেলেটি।

ভাস্কর এবার ইশারা করল গুরুদেবকে চলে যেতে। ভদ্রলোকের মোটেই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্থান ত্যাগ করলেন।

ছেলেটিকে প্রশ্ন করল ভাস্কর, জুলি কত টাকার ক্লেইম করেছে ?

তিন লাখ।

ওর মেয়েকে দেখেছ ?

না। মেয়ে নেই।

মিস্টার শেরিং কি জুলিকে ভালবাসত ?

হ্যাঁ। জুলি ভালবাসত না। জুলি ভালবাসে আমাকে।

ও। কিন্তু জুলির একটা মেয়ে আছে সতের আঠারো বয়স তার। ওই বাড়িতেই আছে। তুমি জানো না ?

জানি না।

মিস্টার শেরিংকে কে হত্যা করেছে ?

হত্যা করেনি কেউ ! সাপের বিষ ইনজেক্ট করেছিল নিজেই। তাতেই মারা গেছে। এটা অবশ্য আত্মহত্যা হতে পারে। জুলি ধরেছিল বলে ডাক্তার এটাকে হার্টফেল বলে চালিয়েছে। আমিও তাই চেয়েছিলাম।

কোন্ ডাক্তার ? কোথায় থাকে ?

পাশেই। হিল কটেজে। ডক্টর এস. কে. রায়।

ঠিক তখনই একটা গাড়ির শব্দ পেল ভাস্কর। সে তাড়াতাড়ি বলল, আজ সকালে তুমি জুলির বাড়িতে গিয়েছিলে। বুঝেছ ? বলে দ্রুত রাস্তার পাশে একটা বিশাল পাথরের আড়ালে চলে এল। আর তখনই জুলি শেরিংয়ের গাড়িটা বাঁক ঘুরে হর্ন বাজাল। ভাস্কর সন্তর্পণে দেখল ব্রেক চেপে গাড়ি থামিয়ে জুলি

মাটিতে নেমে অবাক হয়ে প্রধানকে দেখছে। এই যে একটা গাড়ি এল তাতেও কোনো সম্বিৎ আসেনি প্রধানের। তেমনি শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুহূর্তেই ছুটে গেল জুলি তার কাছে, প্রধান ডার্লিং, কি হয়েছে?

কে?

ও গড! আমাকে চিনতে পারছ না? আমি জুলি। তোমাকে খুব অ্যাবনর্মাল দেখাচ্ছে। কি হল তোমার? উদ্বিগ্ন হল জুলি।

ও জুলি। আমি তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম আজ সকালে। তোমার একটা মেয়ে আছে। মেয়েটার বয়স সতেরো আঠারো। নামতা পড়ার মত কথাগুলো বলে যেতেই টাস করে চড় মারল জুলি প্রধানের গালে। তারপর উন্মাদিনীর মত ধাক্কা দিল সে, ইউ, ইউ। তুমি আজ আমার বাড়িতে চোরের মত ঢুকেছিলে? আমার গার্ডকে অজ্ঞান করে আমার মেয়েকে ভুলিয়েছ তুমি?

সত্যিকারের একটা পুতুল হয়ে গেছে প্রধান। জুলির ধাক্কা তাকে ছিটকে নিয়ে গেল রাস্তার ওপাশে একটা পাথরের ওপর। পাথরটা হয়তো নড়বড়ে ছিল। প্রধানের আঘাত সেটা সহ্য করতে না পেরে কাৎ হয়ে পড়ল একপাশে। আর প্রধানের শরীরটা বেটাল হয়ে গড়িয়ে গেল নিচে। চিৎকার করে ছুটে গেল জুলি পাথরটার কাছে। তারপর অনেকটা ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা ভাস্করের কাছে এমন আকস্মিক যে সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। সে যেদিকে রয়েছে ঠিক তার উল্টোদিকে ঘটেছে ওটা। জুলি শেরিংয়ের মুখ সাদা, ভূত দেখার আতঙ্ক তার চোখে। পরমুহূর্তে সে ছুটে গেল গাড়িতে। তারপর মোটরবাইকের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের গতিতে নিচের দিকে। যেন জায়গাটা ছেড়ে যেতে পারলে সে বেঁচে যায়।

এইবার দৌড়ে এল ভাস্কর। পাথরটা যেখানে বেটাল হয়েছিল সেখানে এসে দেখল নিচে, বেশ নিচে ঢালু উপত্যকায় জঙ্গল ছড়িয়ে। প্রধানের শরীরটা সেই জঙ্গলে ঢুকে গেছে। শুধু তার দুটো পা দৃশ্যমান। কোন রকমে নিচে নামল ভাস্কর। প্রধানের শরীরটা স্পর্শ না করে বুঝল এখনও প্রাণ আছে। মাথার কাছাকাছি কোথাও আঘাত জব্বর হওয়ায় রক্তপাত হচ্ছে। ছেলেটা এখনও অচেতন।

এই মুহূর্তে প্রধানকে তুলে নিয়ে ওপরে ওঠা তার একার পক্ষে অসম্ভব। সে আর দাঁড়াল না। ওপরে ওঠে আসতেই দেখতে পেল কালকের সেই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা ফিরছেন। বৃদ্ধা বৃদ্ধকে কিছু বলতেই তিনি গলা তুললেন, হেই জেন্টলম্যান, গুড ইভনিং! তুমি কি এখনও বাড়িটা খুঁজে পাওনি?

ভাস্করের মনে পড়ল। বুড়ো কালকের কথা মনে রেখেছেন। সে বলল, হ্যাঁ, পেয়েছি। সেখান থেকেই আসছি।

এই সময় পরিত্যক্ত মোটরবাইকটা ওঁদের চোখে পড়ল। বৃদ্ধ বললেন, এটা কার বাইক? কাউকে তো দেখছি না।

বৃদ্ধা বললেন, মনে হচ্ছে সেই ছোকরাটার, যে জুলির বাড়িতে প্রায়ই আসে ! দ্যাট নটরিয়াস চ্যাপ ! লেটস গো।

ওরা হাঁটা শুরু করতেই ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, মাপ করবেন, এখানে কারও বাড়িতে টেলিফোন আছে ?

আছে। ডাক্তার রায়ের বাড়িতে আছে। হিল কটেজ।

খুব দূরে ?

না ! ওইতো, জুলি শেরিংয়ের নেক্সট-ডোর-নেবার।

ভাস্কর দেখল এখান থেকে হেঁটে শহরে পেঁছে পুলিস কিংবা হাসপাতালে খবর দিতে যে সময় লাগবে তাতে রাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অতক্ষণ প্রধানের শরীর ওইভাবে পড়ে থাকলে বাঁচার সুযোগ থাকবে কিনা সন্দেহ। বরং একজন ডাক্তারের বাড়ি থেকে টেলিফোন করতে পারলে হাসপাতাল খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।

বৃদ্ধা-বৃদ্ধা ডাক্তার রায়ের বাড়িটা তাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। গেট খুলে কম্পাউন্ডে ঢুকতে ঢুকতে ভাস্করের খেয়াল হল প্রধানের কথা। এই ডাক্তারই মিস্টার শেরিংয়ের ডেথ-সার্টিফিকেট লিখেছেন জুলির চাপে। যদিও প্রতিবেশী তবু গাছপালার জন্যে জুলির বাড়ি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। এই মানুষটির কথার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে।

ডাক্তার সাহেব যে বাড়িতেই থাকবেন এতটা আশা করেনি ভাস্কর। সে সোজা নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলল, একটা টেলিফোন করতে চাই, খুব জরুরী। অনুমতি দেবেন ?

ডাক্তার পরিচয়পত্রটি দেখার পর সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিলেন, অনুরোধ শুনে সহজ হলেন, অবশ্যই। ওই কোণে রয়েছে।

পর পর দুটো টেলিফোন করল ভাস্কর। প্রথমটা হাসপাতালে। দ্বিতীয়টা লোকাল থানায়। দু'জায়গায় জানাল ক্লিন হার্ট রোডের বাঁকে একটা মোটরবাইক পড়ে আছে। তার পাশে খাদের দিকে উঁকি মারলে নিচে একটি মানুষের শরীর দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনও জীবিত। যদি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে বেঁচে যেতে পারে। দু'জায়গা থেকেই প্রশ্ন করা হল, তার পরিচয় কি ? জবাব না দিয়ে টেলিফোনের লাইন কেটে দিল সে।

ডাক্তার রায় ইনফরমেশনগুলো শুনছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমাদের রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ? কোথায় ?

ভাস্কর তাকে থামাল, আপনি বসুন। পুলিস আর হাসপাতাল তাদের দায়িত্ব বুঝবে। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমার সঙ্গে ? আমি কি করেছি ?

যদি বলি এই অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গে আপনিও জড়িত !

কি আজেবাজে কথা বলছেন ? আমি আজ সারাদিন বাড়ি থেকে বের হইনি।

তাছাড়া কার অ্যাক্সিডেন্ট হল তাও জানি না ! কে আপনি ?

আমার পরিচয় তো একটু আগেই দেখতে পেয়েছেন। আমরা অনেক কিছু করি না জেনে যা অন্য ঘটনাকে ডেকে আনে। মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যুটাকে কি আপনার নর্মাল ডেথ মনে হয়েছিল ? ঈষৎ ঝুঁকে একটা সোফায় বসল ভাস্কর। ইঙ্গিতে ডাক্তারকেও বসতে বলল।

হতবাক হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে এই প্রশ্ন কেন ?

কারণ আপনি সার্টিফিকেট লিখেছিলেন। ডাক্তার রায়, আপনার সম্পর্কে আমার কোন অসদ্ভাব নেই। আমি শুধু আলোচনা করতে চাই এই পরিচয়পত্রের জোরে। বসুন। ভাস্কর আবার কার্ডটা বের করল।

কার্ডটার দিকে আর একবার তাকিয়ে ডাক্তার রায় বিপরীত সোফায় বসলেন। ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল, এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হল কেন ?

কারণ ওটা মিস্টার শেরিংয়ের কাছে অস্বাভাবিক নয়। ওঁর হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার রায় চেষ্টা করছেন স্বাভাবিক হতে।

কিন্তু কেন হার্ট অ্যাটাক্‌ড হল ? সাপের বিষে ?

আই সি ! আপনি দেখছি সবই জানেন। তাহলে আপনাকে আমি খুলেই বলি। মিস্টার শেরিং আমার পেশেন্ট ছিলেন না। পেশেন্ট ছিলেন মিসেস শেরিং। ওঁর প্রায়ই মাথার যন্ত্রণা হয়। মিস্টার শেরিং নেশা করতেন। ওঁদের কোনো দাম্পত্য জীবন ছিল না। মদ গাঁজা ছাড়িয়ে ভদ্রলোক শুনতাম সাপের ছোবল নিতেন। শেষ পর্যন্ত সেটাও খুব কাজে আসত না। তখন মিসেস শেরিং ওঁকে নিয়ে এলেন আমার কাছে। এসব শুনে আমি পরামর্শ দিলাম নেশা ছাড়ার জন্যে। কিন্তু তখন উনি এমন স্টেজে চলে গেছেন যে নেশা না করলে বাঁচবেন না। আমার কাছে শেরিং এলেন কি করে ইঞ্জেকশন নিতে হয় জানতে। আমি ওঁর পরীক্ষা করিয়ে ছিলাম। কোনো বিষাক্ত সাপের বিষ ওঁকে কাহিল করতে পারবে কিনা সন্দেহ ছিল। তবে আমি নিষেধ করেছিলাম। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে বিষ শরীরে নেওয়াতে আমার আপত্তি ছিল। অত্যন্ত অন্যায় ব্যাপার—

ডাক্তারকে থামিয়ে ভাস্কর প্রশ্ন করল, জুলি আপত্তি করেনি ?

আমার আড়ালে করেছে কিনা জানি না তবে বলেছিল কোনো মানুষ যদি ওই নেশা করে আরাম পায় তো সে কি করতে পারে। আমি ওর কষ্টটা বুঝতে পেরেছিলাম। যাক, মিস্টার শেরিং নিয়মিত বিষ শরীরে নিতে লাগলেন ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রায় মাসখানেক বাদে একদিন ওঁর দোকানের ভিতরের ঘরে ইঞ্জেকশান নিয়ে কাউন্টারে বেরিয়ে আসতেই হার্ট অ্যাটাক হল। বিষ তিনি স্বইচ্ছায় নিতেন। তাই কেউ তাঁকে হত্যা করেনি। তিনি বিষ নিয়মিত না নিলেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এবং আত্মহত্যা করার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। ওই পদ্ধতিতে বিষ নিয়ে মাসখানেক বহাল তবিয়তে ছিলেন। তাই এটাকে আমি

আত্মহত্যাও বলতে পারি না।

কেন? এই বিষ তো শেষ পর্যন্ত মরণ ডাকতে পারে জেনেও তিনি নিতেন।

সিগারেট খেলে ক্যান্সার হতে পারে জেনেও মানুষ সিগারেট খায়। তার জন্য কি আপনি বলবেন সে আত্মহত্যা করেছে? দার্শনিক ভাবে হয়তো বলা যায় কিন্তু আইনত? হত্যা কিংবা আত্মহত্যা যখন নয় তখন আমার পক্ষে নর্মাল ডেথ সার্টিফিকেট দিতে বাধা ছিল না।

কিন্তু আপনি ইতস্তত করেছিলেন। জুলি শেরিং আপনাকে চাপ দিয়েছিল সেটা লিখতে, তাই না?

অবাক হলেন ডাক্তার রায়, কে বলেছে আপানাকে?

ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারেন?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ডাক্তার রায়, এটা খেলে আমার ক্ষতি হলেও হতে পারে, আর এটা খেলে আমার ক্ষতি আজ নয় কাল হবেই—এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই আমি সামান্য দ্বিধায় ছিলাম, আত্মহত্যা লিখব কিনা। কিন্তু জুলি আমাকে বোঝাল যে মিস্টার শেরিং মরতে চাননি। তিনি ইঞ্জেকশন নিয়ে কাস্টমারদের দেখাশোনা করবার জন্যে বাইরে এসেছিলেন। এই সময় হয়তো বিষ ওঁর হৃদযন্ত্র স্তব্ধ করে বা—

থামলেন কেন?

কোন বিষের প্রতিক্রিয়া নয়। মিস্টার শেরিংয়ের বয়স হয়েছিল। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার যে কোন কারণ থাকতে পারে। ডাক্তার রায় জানালেন।

কিন্তু ধরুন, সেইদিন মিস্টার শেরিংয়ের সাপের বিষের শিশিতে যদি কেউ অন্য কিছু তীব্রতম বিষ ঢেলে রাখে এবং শেরিং সেটাকেই সাপের বিষ ভেবে শরীরে ইনজেক্ট করেছিলেন, এরকম ভাবনার কথা আপনার মাথায় এল না কেন? ওঁর বডি পোস্টমর্টেম না করে দাহ করতে দিলেন? কেটে কেটে প্রশ্নগুলো করার সময় ভাস্কর বুঝতে পারছিল ভদ্রলোক সত্যি নির্দোষ। কোন মানুষের মাথায় দ্বিতীয় চিন্তা প্রবেশ করলে যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটাই দেখছে সে।

মিস্টার রায় হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ আপনি কি বলছেন? কে খুন করবে ওই বৃদ্ধকে! তিনি তো কারো কাজে, বিশেষ করে মিসেস শেরিংয়ের কোনো ব্যাপারে বাধা দিতেন না। না-না, এ হতে পারে না।

কিন্তু আপনার মনে দ্বিধা এসেছিল ডেথ সার্টিফিকেট লেখার সময়।

স্বাভাবিক। আসতই না, যদি লোকটার নেশার অভ্যেস না থাকত। কিন্তু জুলি বলল, পোস্টমর্টেম মানেই ওর নেশার কথা জানাজানি হয়ে যাওয়া। তাছাড়া এটা হত্যা বা আত্মহত্যা না হলেও ওই কারণেই নাকি সে কিছু টাকা পাবে না ইন্সুরেন্স কোম্পানী থেকে। ব্যাপারটা সমর্থন করেছিল প্রধান। আমি ভাবলাম বিধবা মেয়েটা কেন বিনা দোষে বঞ্চিত হবে।

ডাক্তার রায়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র ভাস্কর উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল,

আপনি মনে হয় নির্দোষ। তবে সেটা প্রমাণিত হবে যদি আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এই সংবাদ তৃতীয় ব্যক্তি না জানে।

বিস্মিত মানুষটিকে পেছনে রেখে ভাস্কর বাইরে এসে দেখল মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সন্ধ্যে হয়ে এল বলে। আর দু-পা হাঁটতে না হাঁটতেই পথের আলোগুলো জ্বলে উঠল। দুর্ঘটনার জায়গায় এসে দেখল মোটরবাইকটা রয়েছে। পুলিসের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন পুলিস কিছু খোঁজাখুঁজি করছে। টর্চ জেবলে ওরা নিশ্চয়ই প্রধানের শরীরটাকে এতক্ষণে হাসপাতালে পেঁছে দিয়েছে। এবং তখনই ওর খেয়াল হল। প্রধানকে বাঁচাতে হবে। যে করেই হোক। দুর্ঘটনার জন্যে যদি ও না মারা যায় তাহলে ওকে আজকালের মধ্যে মেরে ফেলার চেষ্টা হবেই। জুলি শেরিং কোনো প্রমাণ রাখতে চাইবে না। এবং তখনই সে অনিল মিত্রকে দেখতে পেল। দুজন পুলিসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিচ থেকে উঠে আসছে।

ভাস্করকে দেখে চমকে উঠল অনিল মিত্র। তারপর চিৎকার করে বলল, হোয়াট এ সারপ্রাইজ! তুমি এখানে?

এই তো। কেমন আছো? ভাস্কর হাসল।

ছিলাম ভালই। এইমাত্র একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। আবার ঠিক এটাকে অ্যাকসিডেণ্ট বলতেও মন চাইছে না। লোকটা আমাদের পরিচিত। মোটর-বাইকটাকে মাঝ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে নিচের ওই ঝোপে পড়েছিল। ভঙ্গী দেখে বোঝাই যাই আত্মহত্যা করতে চায়নি। কোন গাড়ির সঙ্গে ক্ল্যাস হলে মোটরবাইকটা নিটোল থাকত না। নিজের মোটরবাইকটাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে ছেলেটা কি করে ওই খাদে গিয়ে পড়ল সেটাই বুঝতে পারছি না।

রহস্যজনক ব্যাপার! ও বেঁচে আছে?

হ্যাঁ। মাথায় চোট লাগায় বেহুঁস হয়ে আছে। হসপিটালাইজ্‌ড করা হয়েছে।

ওখানে গার্ড রাখো যদি ছেলেটিকে বাঁচাতে চাও।

মানে?

যদি এটা হত্যাকাণ্ড হয় তাহলে হত্যাকারী চাইবে না ও বেঁচে থাকুক। কে ধরা পড়তে চায় বল?

অনিল মিত্র চিন্তা করল একটু, তুমি ভালই বলেছ। ছেলেটার স্টেটমেণ্ট নেওয়া যায়নি এখনও। এখানে তো কোনো ক্লুও পেলাম না। কাল সকালে আর একবার আসব। বাই দ্য বাই, উঠেছ কোথায়?

কাঞ্চনজঙ্ঘা লজ।

যাচ্চলে! ওটা তো টিবেটিয়ানদের। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে। কি ব্যাপার?

কোন ব্যাপারই নয়।

অনিল মিত্র ওকে হোটেল পর্যন্ত লিফট দিল। বাজারের গায়ে ওর গাড়ি থেকে

নামিয়ে বারংবার বলল সোজা ওর কোয়ার্টার্সে চলে আসতে। ভাস্কর কোনো কথা জানায়নি। দেখা যাক, আর একটু দেখা যাক। এমন কি একজন বাঙালি যে টেলিফোনে খবরটা দিয়েছিল কিন্তু পরিচয় জানায়নি—তাকে নিয়েও দুশ্চিন্তা অনিল মিত্রের।

অনিলের জিপটা চলে যাওয়া মাত্র ভাস্করের মনে হল এবার একটু ভারী বয়সের পোশাক পরা দরকার। সে হোটেলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসতেই সামনে দাঁড়াল পদম বাহাদুর, সেলাম সাহেব।

ভাস্কর হাসল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

আরে বাপ! আপনাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তামাম শহরে। এখন দেখছি খোদ এস-পি সাহেবের জিপ থেকে নামছেন। ওই জীপ দেখতে পেলে আমরা ত্রি-সীমানায় আসি না। এস-পি সাহেব আপনাকে যখন নামাতে এসেছিল তখন আপনি আরও ভারী অফিসার। হুকুম করুন সাব, এখন আমাকে কি করতে হবে? পদম সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তুই এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি হোটেল থেকে ঘুরে আসি।

নিজের ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে ভাস্কর শুনল পাশের ঘরে দরজাটা খুলে গেল। তারপর টলায়মান পায়ে শাহজাহান যেন এগিয়ে এল, কি ব্যাপার স্যার! গুরুদেব হাওয়া হয়ে গেলেন!

তাই নাকি?

হ্যাঁ বিকেলে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে মালপত্র নিয়ে উধাও।

হোটেল চেঞ্জ করেন নি তো?

না-না। আমি নিজে ওকে লাস্ট বাসে তুলে দিয়েছি। আর হ্যাঁ, এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বলে গিয়েছিলেন। শাজাহানের কাঁপা হাত থেকে খামটা নিয়ে ছিঁড়ল ভাস্কর। সাদা কাগজে গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে, মহিলা মারাত্মক। চোখের সামনে যা দেখলাম তারপর আর এই শহরে থাকা আমার পক্ষে সেফ নয়। উদোর পিণ্ডি চিরকালই বুধোর ঘাড়ে পড়ে! মুচকি হেসে চিঠিটা পকেটে রেখে দরজা খুলল সে। শাজাহানকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিল না ভাস্কর। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন গুরুদেব। স্থান ত্যাগ করেও তিনি হোটেলে ফিরে আসেন নি। কোনো আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। নাটকটা দেখার পর মনে হয়েছে ছেলেটির পড়ে যাওয়ার পেছনে সম্মোহন কাজ করেছে। আর ঝুঁকি নিতে চান নি ভদ্রলোক। ভালই হল। লোকটা যা করত সেটার দ্বিতীয় অংশে অপরাধ ছিল। চাপ দিয়ে টাকা আদায় করা আইনের চোখে অন্যায়। কিন্তু সম্মোহনের প্রভাবে যদি কেউ ভেতরের কথা বলে দেয় তাহলে আইনের কিছু করার আছে কিনা বলা শক্ত। তবে লোকটা ঠিক সময়ে বিদায় নিয়েছে।

জামাকাপড় পাল্টে বাইরে এল। তার আগ্নেয় অস্ত্রটিতে ছটি গুলি আছে। ঈশ্বর করুন, এগুলোর একটাও যেন তাদের স্থান ত্যাগ না করে। এখন ভাস্করের

পরনে র‍্যাংলারের জিনিস, স্কিন টাইট চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে বারান্দা দেওয়া টুপি। শাজাহান সেনের সঙ্গে সে ইচ্ছে করেই দেখা করল না। ফালতু কিছু সময় নষ্ট হবে। বাড়ি থেকে পালিয়ে লোকটা এখানে আসে শুধু মদ্যপান করতে। মানবচরিত্র বুঝতে চাওয়া ঈশ্বরেরও অসাধ্য।

পদম বাহাদুর চটপট চলে এল, সেলাম সাহাব। ভাস্কর বুঝতে পারছিল ওর চোখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেন হিন্দী ছবির কোনো নায়ককে সে চোখের সামনে দেখছে। ভাস্কর বলল, সেই মদের দোকানে যাব। তোর সঙ্গে ছুরিটা আছে তো?

জী সাব! যেন একটা কাজের ইঙ্গিত পেল পদম।

পদমকে পায়ের গোড়ালিতে নিয়ে ভাস্কর ম্যাল রোডে যখন উঠে এল তখন বড় দোকানগুলোয় ঝকঝকে আলো জ্বলছে! উল্টো রাস্তা দিয়ে নামতে নামতে পদম বলল, সাহেব, আমাকে কি ভেতরে ঢুকতে হবে? ভাস্কর মাথা নাড়ল।

কিন্তু সাহেব, আমি তিব্বতীদের মদ সহ্য করতে পারি না।

করতে হবে না।

অর্থ ধরতে পারল পদম। ভাস্করের সঙ্গে হাঁটার তাল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল সে। এই পথে আলো আছে। কিন্তু সাতটা বাজতে না বাজতেই চারধার কেমন নিঝুম হয়ে গেছে। পাশের বাড়িগুলোয় কোনো শব্দ নেই এই শহরে রাত আসে সন্ধ্যের ঘাড়ে চেপে। এবং এলেই মানুষজন ঝিমিয়ে পড়ে।

খুশ-মেজাজী পানশালার সামসে এসে পদমের পা থেমে গেল। ভাস্কর বলল, কি হল?

আমাকে ভেতরে যেতেই হবে সাব?

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে মায়া হল ভাস্করের। সে জিজ্ঞাসা করল, তোর মতন মাস্তান ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে কেন?

একটা গোলমাল হয়েছিল তিন মাস আগে ওখানে। তারপর ওদের বারম্যান জোহাং বলে দিয়েছিল আমি যেন ভেতরে আর না ঢুকি। ও শালা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে।

ঠিক আছে। আমার বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই তুই চলে আসবি। আমি খুব বিপদে না পড়লে আওয়াজ করব না।

ভাস্কর আর দাঁড়াল না। মিসেস শেরিংয়ের গাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার একটা ধারে পার্ক করা আছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। ফাঁকা বারান্দায় পা দিয়ে দরজাটা ঠেলতেই তীব্র মদের গন্ধ নাকে এল। সোজা ভেতরে ঢুকতেই স্প্রিং-এর চাপে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এখন প্রায় প্রতিটি টেবিল ভরতি। প্রত্যেক টেবিলে একজন করে বসে পান করছে। একটা বাজনা বাজছে রেকর্ডে। যারা খাচ্ছে তারা কোনো কথা বলছে না। কাউণ্টারের দিকে তাকাল সে। সকালের সেই স্বাস্থ্যবান লোকটি নেই। তার বদলে যে খদ্দেরদের দেখছে তাকে চিনতে পারল

ভাস্কর। আজ সকালেই তাকে অজ্ঞান করে রেখেছিল। তার মানে শেরিংদের বাড়ির প্রহরী বদল হয়েছে। আরও শক্তিশালী এবং বিশ্বাসী লোক ওখানে গিয়েছে পানশালা ছেড়ে।

বসার জায়গা না পেয়ে সে সামনে পা বাড়াতে বারম্যান মুখ তুলে তাকাল। লোকটার পক্ষে তাকে চেনা মোটেই সম্ভব হবে না। কারণ সে ওকে পেছন থেকে আঘাত করেছিল। কাউণ্টারে পৌঁছে সে মেজাজে বলল, এ কেমন বার যেখানে বসার জায়গা পাওয়া যায় না! আমি কি দাঁড়িয়ে খাব? লোকটা তার চেরা চোখে দেখল, এরা সব রেগুলার কাস্টমার। দাঁড়িয়ে খেতে না ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারেন।

আমি তো চলে যেতে আসিনি?

লোকটা একটু অবাক হয়ে ভাস্করকে দেখল। ভাস্কর বলল, ভেতরে তো অনেক ঘর দেখছি। তার একটায় চেয়ার নিয়ে বসতে পারি।

ওখানে বসার জায়গা নেই। খেতে হলে এখানেই, নইলে কেটে পড়। ঝামেলা-বাজ লোকদের জন্যে আমার অন্য ব্যবস্থা আছে।

তাই নাকি? আমি ওই ঘরটায় বসব। ইঙ্গিতে কাউণ্টারের পেছনের একটা ঘর দেখাল ভাস্কর।

কি? মেমসাহেবের ঘরে? চটপটে হাতে লোকটা কাউণ্টারের নিচ থেকে একটা রবার জড়ানো রড বের করতেই ভেতর থেকে জুলি শেরিং বেরিয়ে এল, হোয়াটস দ্য প্রব্লেম?

বারম্যান কিছু বলার আগেই ভাস্কর বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

হু দ্য হেল য়ু আর?

ভাস্কর আশ্বস্ত হল। যাক ভদ্রমহিলা হয়তো টুপি এবং স্থানের জন্যেই তাকে এখনও চিনে উঠতে পারেননি।

আপনার স্বামীর ইন্সুরেন্স-এর ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।

ইন্সুরেন্স?

ভাস্কর পকেট থেকে আইডেণ্টিটি কার্ডটা বের করে খুলে মহিলাকে দেখাল। এক মুহূর্ত দ্বিধা। তারপর জুলি শেরিং মাথা নেড়ে বলল, ভেতরে আসুন। তারপরেই তিব্বতী ভাষায় কিছু নির্দেশ বারম্যানকে দিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। বারম্যান তখনও তীব্র চোখে ভাস্করকে দেখছে। ভাস্কর আর ইতস্তত না করে কাউণ্টারের সুইংডোর খুলে ভেতরে পা দিল।

দরজায় এসে দাঁড়াতেই সে দেখল একটা বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে আছে জুলি। তাকে দেখামাত্র উল্টোদিকের একটা চেয়ারে ইশারা করে বলল, বসুন।

ভাস্কর দেখল ঘরে আর একটা দরজা আছে। আসবাব বলতে ওই টেবিল

আর কয়েকটা চেয়ার। দেওয়ালে এক টিবেটিয়ান বৃদ্ধের ছবি। সম্ভবত উনিই মিস্টার শেরিং। পাকানো জীর্ণ শরীর।

আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো!

এই টুপি এবং চামড়ার জ্যাকেট বিভ্রান্তি এনেছে। সে ধীরে ধীরে টুপিটা খুলে টেবিলে রাখতেই জুলি চমকে উঠল, আরে, আপনিই আজ বিকেলে একজন গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিলেন না?

ঠিকই।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন্ পরিচয়টা সত্যি?

ওটা প্রমাণ করা মুস্কিল হবে। আর এই আইডেন্টিটি কার্ড সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় নিশ্চয়ই?

তখন প্রশ্ন করলেন না কেন?

তখন শুধু আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম। শুনুন, হেড-অফিস আমাকে পাঠিয়েছে। মিস্টার শেরিংয়ের নর্মাল মৃত্যুর খবর থাকা সত্ত্বেও হেড-অফিস নিজের লোক দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়। কারণ টাকার অঙ্কটা মোটেই কম নয়। ভাস্কর অত্যন্ত তৎপর গলায় কথাগুলো বলে চোখের দিকে তাকাল।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জুলি, বুঝলাম। আমার স্বামীর অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এখানে এক হলঘর মানুষ দেখেছে তিনি বুকের যন্ত্রণায় ঢলে পড়েছেন। কেউ তাকে আঘাত করেনি। ডাক্তার পরীক্ষা করে সেই রকম সার্টিফিকেট দিয়েছে। এখন আপনার কোম্পানী আমাকে টাকাটা দিতে বাধ্য। যদি তা না দেয় তাহলে আমি কেস করব।

কেসে আপনি জিতবেন কি হারবেন সেটা আমার ওপর নির্ভর করছে। কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল ভাস্কর। তারপর দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, প্রধান আমাকে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন সে এখন কোথায়?

মুহূর্তেই জুলির মুখ মোমের মত সাদা হয়ে গেল, কোথায়?

হাসপাতালে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে।

প্রধান কি বলেছে আপনাকে? নির্লিপ্ত গলায় কথা বলতে পারছিল না জুলি।

আজ সকালে সে আপনার বাড়িতে গিয়েছিল।

ইয়েস। হি ইজ এ চিট্। থিফ। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল জুলি। হতে পারে। কিন্তু আপনার বাড়িতে আর একজনের অস্তিত্ব সে জানিয়েছে।

দাঁড়ান। ভাস্করের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে কাঁধ নাচাল জুলি। তারপর বলল, আমাকে ভয় দেখিয়ে কেউ পার পায় নি কিন্তু।

ভয় দেখাতে যাব কেন?

বেশ, কাল ন'টায় আমার ওখানে আসুন। ব্রেকফাস্ট করবেন। হঠাৎ জুলি প্রসন্ন মুখে নিমন্ত্রণ করল।

ঠিক আছে। তবে দয়া করে ইলেকট্রিক অফ করতে ভুলবেন না। প্রধান এই তথ্যটাও জানিয়েছেন। নমস্কার।

লম্বা পা ফেলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে কাউন্টারে দাঁড়াল। তারপর মদ্যপানরত মানুষগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে সে হলঘর পেরিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে পদম বাহাদুরকে খুঁজল। কাঠের সাঁকোটা পার হয়ে আসা মাত্র পদম শিস বাজিয়ে অস্তিত্ব জানাল।

BANGLADDIT

পদমকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছিল ভাস্কর। এখন অবধি যা অঙ্ক পাওয়া গিয়েছে তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না মিস্টার শেরিংকে কেউ খুন করেছে। এবং এই কেউটির মুখোশ খুলে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাস্করের মনে একটা খুঁত-খুঁত ভাব থেকেই যাচ্ছিল। জুলি শেরিং জানে এটা হত্যাকাণ্ড প্রমাণিত হলে সন্দেহটা তার ওপরেই প্রথম পড়বে। এবং সেটা জেনেও কেন সে বিষের শিশি এবং সিরিঞ্জ রেখে দিল বাড়িতে? হোক না লুকোন জায়গায় কিন্তু নষ্ট করল না কেন? দ্বিতীয়তঃ বাড়িতে সে নিজের মেয়েকে অত্যন্ত গোপনে রেখে দিয়েছে যা তার আপাত-বন্ধু প্রধানও জানত না। যদি সত্যি সে প্রধানের সঙ্গে জড়িত থাকতো তাহলে এই সত্য একদিন না একদিন ফাঁস করতেই হত।

ঠিক এই সময় একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। গাড়িটা তীব্র গতিতে ওপরে উঠে আসছে। পদম বলল, সরে আসুন সাহেব। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে ড্রাইভারের মাথার ঠিক নেই। এই বলে সে রাস্তা থেকে এক পা উঁচুতে উঠে দাঁড়াল। ভাস্কর এবার আলোটা দেখতে পেল। এখানে পথ বেশি চওড়া নয়। দুপাশের পাহাড় নেমে এসে পথটাকে যেতে দিয়েছে। আলোটা এ পাহাড় সে পাহাড় ঝেঁটিয়ে ওপরে উঠে সোজা হল। যেন বিশাল চোখে দুটো হায়না তেড়ে আসছে। ড্রাইভারের হাত কাঁপছে। পদম আবার চেঁচালো, হঠ যাইয়ে সাব।

এবং শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে ওপরে উঠতেই গাড়িটা তীব্র গতিতে পাহাড়ের যে ধারে ওরা হাঁটছিল সেদিকটা ঘেঁষে তেড়ে এসে না পেরে ছিটকে এগিয়ে গেল সামনে। তখনই দড়াম করে একটা আওয়াজ এবং কাচ ভেঙে পড়ার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল রাত্রের নিস্তব্ধতায়।

পদমের চাপা গলা শোনা গেল, শালে শুয়ার কি বাচ্চা!

পাথরটা ছুঁড়েছে পদমই। সেটা গিয়ে সোজা আঘাত করেছে গাড়ির পেছনের কাচে। ড্রাইভার বোধহয় এইটে আশা করে নি, থতমত হয়ে ব্রেক করতেই বোধহয়

চেতনায় ফিরে এল। ভাস্করেরা দৌড়ে যাওয়ার আগেই সে গাড়ি সমেত উধাও। পদম বলল, পাহাড়ে এইরকম খুবই হয়। মাল খেয়ে সব শালা আমজাদ হয়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছে করলে কাল-পরশু এই গাড়িটাকে ধরা যাবে। কাচ পাল্টাতে ওকে গ্যারেজে যেতেই হবে। সাহেব যদি চান তাহলে এই কাজটুকু করতে পারি।

ভাস্কর মাথা নাড়ল, তোর দরকার হবে না। আমি পুলিসকেই বলব। তুই বরং একটা কাজ কর। সামনের বাঁকটা থেকে আড়ালে চলে যাবি। দেখবি কেউ আমার পিছু নিয়েছে কিনা। যদি নেয় তাহলে দুপুরে যে হোটেলে খেয়েছিলাম সেখানে এসে আমাকে জানাবি। ঠিক আছে?

একটা কাজের মত কাজ পেল যেন পদম। বাঁকটা আসা মাত্র সে নিমেষের মধ্যেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভাস্কর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একা বড় বড় পা ফেলে হেঁটে আসছিল। এখন এই শহরটা আপাত চোখে ঘুমন্ত। শীত আরও বাড়ছে। কিন্তু ভাস্কর ভাবছিল জুলি শেরিং এই ভুলটা করতে গেল কেন? নির্জন পথে গাড়ি চাপা দিয়ে কাউকে মারতে যাওয়া সব সময় সফল হবে এই রকম ভাবনা এল কেন মাথায়? এতক্ষণ জুলি সম্পর্কে তার যে দ্বিধাটা জন্মাচ্ছিল সেটা আবার ম্লান হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা কাজ করল, হয়তো গাড়িটা জুলি পাঠায়নি। যে পাঠিয়েছে সে এখনও পর্দার আড়ালে রয়েছে। এমনও তো হতে পারে।

একসঙ্গে খাওয়া শেষ করে হোটেলে ফিরে এল ভাস্কর। পদমকে সে সকাল আটটায় হোটেলে দেখা করতে বলল। না, পদমের রিপোর্ট অনুযায়ী তাকে কেউ অনুসরণ করেনি। পদম এ ব্যাপারে খুব নিঃসন্দেহ। তাছাড়া যেসব চোর-বাট-পাড়-গুণ্ডা এসব কাজ করে তাদের নাড়িনক্ষত্র পদম জানে। তাদের কাউকেই পদম দ্যাখেনি, শুধু সাহেব চলে আসার পর একজন মহিলা গাড়ি নিয়ে উঠে এসেছিল। সেটা সাহেব চলে আসার পনেরো মিনিট পরে। ভাস্কর তাকে দেখেনি। হয়তো সে ততক্ষণে শহরের তেমাথা পেরিয়ে চলে এসেছে।

অতএব এইটুকু ধরে নেওয়া যায় কেউ তার পেছনে আসেনি যখন তখন আজকের রাত্রের মত সে নিরাপদ। হোটেলে ঢুকতেই রিসেপশনের সামনের চেয়ারে শাজাহান সেনকে বসে থাকতে দেখল ভাস্কর। ওকে দেখামাত্র শাজাহান যেন প্রাণ ফিরে পেল, ওঃ, আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।

ভাস্কর হেসে ফেলল, কোনো মেয়ে যা করে না আপনি তাই করলেন?

ইয়ার্কি না ! আমাকে তো আজ থেকে যেতে বললেন। বিকেলে একটু মদের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম, এসে দেখি গুরুদেব হাওয়া আর তার জায়গায় একটা বিশাল ভল্লুকী শুয়ে জপ করছে। উঃ কি মারাত্মক চাহনি ! আর আমার ব্যাগ থেকে মাত্র দশটা টাকা রেখে তিনি সব নিয়ে গেছেন। প্রায় কেঁদে ফেলল শাজাহান।

পুলিসে জানিয়েছেন ?

দূর ! পুলিস গুরুদেবের কি করবে !

করবে। কারণ আপনার গুরুদেব যখন হোটেলে ফিরছেন তখন কোন বাস নিচে নামে না। আমার মনে হয় না তিনি নিজে একটা গাড়ি ভাড়া করে রাত্রের পাহাড়ী পথে নামবেন। অর্থাৎ এই শহরে খুঁজলেই তাঁকে পাওয়া যাবে। আচ্ছা, চলুন আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

শাজাহানকে নিয়ে বেরিয়ে এল ভাস্কর। বেচারার অবস্থা খুব কাহিল। কাল সকালে হোটেল থেকে বেরুবারও উপায় নেই। বিল মেটানোর পয়সা নেই। এর-পরে গাড়ি ভাড়া আছে। লোকটার ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল ভাস্করের। সম্মোহন করে টাকা আদায় করে খুশি হয়নি, এই ছ্যাঁচড়ামো পর্যন্ত করল।

অনিল মিত্র সব ব্যাপারটা শুনে জিজ্ঞাসা করল, এই রকম একটা লোক তোমার হোটেলে ছিল বিকেলে বললে না কেন ?

তখন তুমি একটা প্রব্লেম নিয়ে ছিলে আর আমারও মাথায় আসেনি। বাট আই অ্যাম সিওর, ও এই শহরে এখনও পর্যন্ত আছে।

তুমি লোকটার যে বিবরণ দিলে তাকে আমি কিছুক্ষণ আগে হাসপাতালে দেখেছি। যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে—। অনিল মিত্রকে চিন্তিত দেখাল।

হাসপাতালে ? ভাস্কর অবাক হল।

হ্যাঁ। আজ একটা কেস পেয়েছি। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছে—ওহো, তুমি তো জানো, সেই স্পটেই দেখা হল। তোমাদের বিবরণ-মাফিক লোকটি হাসপাতালে গিয়ে অনুরোধ করেছিল সে পেশেণ্টকে একবার দেখতে চায়। ওর জ্ঞান তখনও ফেরেনি বলে দেখতে দেওয়া হয়নি। ও যখন গিয়েছিল তখন আমি হাসপাতালে ছিলাম। বাই দ্য বাই, ছেলেটির পরিচয় তুমি জানো ? অনিল মিত্র সরাসরি প্রশ্ন করল।

ভাস্কর এত তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রকাশ করতে চায়নি। অথচ সোজাসুজি মিথ্যে কথা বলতেও খারাপ লাগছিল, তুমি তো বলেছিলে চেনা মানুষ।

হ্যাঁ। এই শহরের একজন নামকরা রোমিও। কাজ করে ভাল! ইনফ্যাক্ট তোমাদের কলিগ্ বলতে পার।

কলিগ্? যতটা সম্ভব বিস্ময় দেখাল ভাস্কর।

হ্যাঁ। তোমাদের ইন্সুরেন্স ডিপার্টমেণ্টের স্থানীয় এক কর্তা ওই ছোকরা। সম্প্রতি এক বিধবা টিবেটিয়ান মহিলার সঙ্গে মাখামাখি হচ্ছিল। মহিলা একটু রহস্যময়ী।

রহস্যময়ী এই কারণে যে তিনি বাইরের কারও সঙ্গে মেশেন না। স্বামী বেঁচে থাকলেও ওদের মদের দোকান আর বাড়ি ছাড়া মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে নির্জন পাহাড়ে একা বসে থাকেন। দো শি ইজ টিবেটিয়ান কিন্তু তাকে দেখলে মনে হবে শি ইজ ফ্রম হলিউড্।

হাসল অনিল।

BANGLADPATHI

ফেরার পথে হাসপাতালে এল ওরা। না এখনও প্রধানের জ্ঞান ফেরেনি। হেড-ইনজুরি। ডাক্তার বলছেন বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে কোন ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়। ভাস্কর দেখল যে ব্লকে প্রধান রয়েছে তার বারান্দায় দুটো সেপাই পুতুলের মত দাঁড়িয়ে। যারা বুদ্ধিমান তাদের পক্ষে ওদের কাঠের পুতুল বানিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। প্রধানের প্রাণনাশের চেষ্টা হলে আটকাবে কে? তবে ও বেঁচে থাকলেও বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে কোন সাহায্যে আসবে না। বাহাত্তর ঘণ্টা অনেক দীর্ঘ সময়। যা করার এর মধ্যেই করতে হবে।

থানা-পুলিস করে শাজাহান সেন একটু ভরসা পেয়েছিল। ভাস্কর অনিল মিত্রকে দিইয়ে বলিয়েছে লোকটাকে আগামীকালই খুঁজে বের করা হবে। তাছাড়া ওর কাছে যদি টাকা নাও পাওয়া যায় তাহলে পুলিসের অয়ারলেসের মাধ্যমে শাজাহানের বাড়িতে খবর দেওয়া যাবে টাকা পাঠিয়ে দিতে। দু-তিনদিন আরও থেকে যেতে হবে সেক্ষেত্রে। ভালই হবে এতে। কারণ শাজাহান স্বীকার করল এতবার সে এসেছে কখনই দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখা হয়নি। মদ খেতে খেতেই তার সময় গিয়েছে। এখন যে দুদিন অপেক্ষা করতে হবে তাতে তো মদ খাবার পয়সা থাকবে না, সুযোগটা কাজে লাগানো যাবে। তবে ওই টিবেটিয়ান রুমমেটকে নিয়ে থাকা—এটাই প্রধান সমস্যা।

শাজাহানকে হোটেলে পাঠিয়ে ভাস্কর রাস্তা পাল্টালো। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল গুরুদেব জুলি শেরিংয়ের বাড়িতে যাবে। ব্ল্যাকমেল করা যার নেশা সে

এই সুযোগ ছাড়বে না। আরও কিছু খবরের জন্যে প্রধানকে কথা বলাতে চেয়েছিল নিশ্চয়ই। লোকটা জেনেছে ইন্সুরেন্সটা যদি হেড অফিস অনুমোদন না করে তাহলে জুলি প্রধানকে বিয়ে করবে না। এর মানে ব্যাপারটায় কিছু ভাঁওতা আছে। আর জুলি যে ফেলে দিয়েছে ছেলেটিকে সেটাও লোকটা কোনো আড়াল থেকে চাক্ষুষ করতে পারে। অতএব নিশ্চয়ই এতক্ষণে লোভের সাপ ফণা তুলেছে। পৃথিবীর যে কোনো নেশার চেয়ে যা মারাত্মক।

পথ নির্জন, ঠাণ্ডাটা বাড়ছে হুহু করে। রাস্তার আলোগুলোকে কুয়াশায় ডাইনীর চোখের মত দেখাচ্ছে। দু-পকেটে ভাস্করের হাত, এক হাতে রিভলভারের স্পর্শ। পদমটাকে ছেড়ে না দিয়ে সঙ্গে আনলে ভাল হত।

প্রধানের কাণ্ডটা যেখানে ঘটেছিল সেখানে এখন কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এই শহরে বোধহয় রাত ঘনালে গাড়ি করেও মানুষ বের হতে চায় না। বাঁক ঘুরতেই জুলির বাড়িটা চোখে পড়ল। ছবির মত চুপচাপ। কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। গুরুদেব যদি এসে থাকেন তাহলে তো এতক্ষণে আলো জ্বলা উচিত ছিল। কারণ জুলির গাড়িটা বাড়ির সামনে দেখা যাচ্ছে। নিজেকে আড়ালে রেখে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল ভাস্কর। না, বাড়িটায় কোনো মানুষ জেগে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আর থাকলেও গুরুদেব নেই। জুলি শেরিং আলো নিভিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলার পাত্র নয়।

ঘুম ভাঙ্গল একটু দেরীতে এবং দরজায় শব্দ হওয়ায়। ভাস্কর খানিকটা সময় নিয়ে দরজা খুলতে দেখল একজন সেপাই দাঁড়িয়ে আছে খাম হাতে। ওর নাম জিজ্ঞাসা করে খামটা দিয়ে চলে গেল সে। খানিকটা অবাক হয়ে সে চিঠিটা বের করল অনিল মিত্র জানিয়েছে লোকটির হদিশ পাওয়া গিয়েছে। সে উঠেছে একটা প্রাইভেট গেস্ট হাউসে। তবে জিনিসপত্র রেখে সন্ধ্যে নাগাদ সেই-যে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। ফিরলেই ওকে ধরে ফেলা যাবে। আর হ্যাঁ, প্রধানকে বাঁচানো যায়নি। কাল রাত তিনটে নাগাদ অজ্ঞান অবস্থায় সে মারা গিয়েছে। পোস্ট-মর্টেমের জন্যে বডি রেখে দেওয়া হয়েছে।

ঠোঁট কামড়ালো ভাস্কর। একজন সাক্ষী চলে গেল। মৃত্যুটা কি আঘাত-জনিত না নতুন কোনো প্রচেষ্টায় সেটা চিঠিতে বোঝা যাচ্ছে না। আর এই গুরুদেবটি কোথায় গেলেন জিনিসপত্র ফেলে। ওর এক সিড়িঙ্গে শিষ্য ছিল সে-ই বা কোথায়? ঘড়ি দেখল ভাস্কর। সর্বনাশ। ন-টা বাজতে আর বেশী দেরি নেই। এই পাহাড়ি

শহরগুলোর আবহাওয়া বড্ড সময় আড়াল করে রাখে। আজ রোদ নেই। সকালটা শুরু হয়েই যেন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মাথার ওপর বড্ড বেশী মেঘের চলাফেরা চলছে এখন।

BANGLAPDF.NET

ঠিক পাঁচ মিনিট আগে জুলি শেরিংয়ের বাড়ির কাছাকাছি পেঁছে গেল ভাস্কর। পদম বাহাদুর তার পেছনে। ও ঠিক সময়ে সঙ্গ নিয়েছে। শাজাহানবাবু বেরিয়েছেন পর্যটনে। পদমকে যা বোঝাবার এতটা পথ চলার সময় বুঝিয়ে দিয়েছে ভাস্কর। জুলি শেরিংয়ের বাড়িটা চোখে পড়া মাত্র সে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল এমন একটা জায়গা খুঁজে নিতে যেখান থেকে দেখা এবং শোনার দুটো কাজই চমৎকার চলে।

সাদা পুলওভার এবং স্টোন-ওয়াল প্যাণ্টে নিজের চেহারাটা যে আরও খুলেছে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিল ভাস্কর। হোটেলের বুড়িটা তো বটেই এই পদমটা পর্যন্ত তার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকিয়েছে। কি দেখছে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল, সাহেব, অনেক নাম-করা ফিল্মস্টার এখানে আসে শুটিং-এর জন্যে, তারাও তোমার কাছে এখন হার মেনে যাবে।

ভাস্কর সুপুরুষ। তবে কিছু কিছু পোশাক তাকে আরও আকর্ষণীয় করে এ তথ্য তার জানা। একজন সুন্দরী মহিলার কাছে আসতে হলে নিজের চেহারা খোলতাই করাই উচিত। এবং তখনই ওর সেই মেয়েটিকে মনে পড়ল। কাল থেকে প্রায়ই ওকে মনে পড়ছে। এভাবে কোনো মেয়ে তাকে কখনও টানেনি। কিন্তু জুলি যদি হত্যাকারী হয় বা মেয়েটির যদি এদেশে আসার ভিসা না থাকে তাহলে সে কি করতে পারে? ভাস্কর প্রার্থনা করছিল ওই দুটোই যেন বেঠিক হয়।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল সে। বেশ ঘন ছায়া বাগানে। সকাল ন'টায় মেঘ নেমে এসেছে মাথার ওপরে। বৈদ্যুতিক তারের জায়গাটায় এসে সে সতর্ক হল। সেই সময় দরজা খুলে গেল। এবং ভাস্করের সমস্ত শরীরে আর এক রকমের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল। জুলি শেরিং দরজা খুলে আশ্চর্য রকমের মিষ্টি হাসি হাসল তার দিকে চেয়ে। মহিলার বয়স বোঝাই যাচ্ছে না। অতিরিক্ত রকমের একটা লাল শর্টস আর দুধেল গেঞ্জি ওর পরনে। পায়ে ঘাসের চটি। চোখে নীল হরিণচোখো চশমা। মাথার চুল ফেঁপে মেঘ হয়ে দুলছে। যদিও মেঘের জন্যে ঠাণ্ডা আজ কম কিন্তু এত ছোট প্যাণ্ট পরার মত আবহাওয়া নয়। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জুলি হাসল আবার, হা-ই!

ভাস্কর পা ফেলল। লুকনো তারে যদি বিদ্যুৎ থাকত তাহলে জুলি নিশ্চয়ই ওকে ডাকত না। এগিয়ে যেতে সে বলল, হ্যালো!

ঘরের ভেতরে ঢুকে জুলি বলল, আপনার দেখছি চমৎকার সময়জ্ঞান। এখন ঠিক নটা।

ভাস্কর জুলির দিকে না তাকিয়ে সোফায় বসতে যাচ্ছিল। এই মহিলার বয়স সে জানে কিন্তু যা দেখছে তার সঙ্গে কিছুতেই মেলে না। সব মেয়ের শরীরে চুম্বক থাকে না। ঈশ্বর কাউকে কাউকে সেটা দীর্ঘকালের জন্যে লিজ দিয়ে দেন। জুলি সেই রকম। আজকের এই পোশাক, উন্মুক্ত দীর্ঘ উরু এবং পায়ের গোছ যা কিনা শঙ্খের চেয়ে সুন্দর, না দেখলে সে এর হদিশ পেত না। এই মহিলার কি করে অত বড় মেয়ে থাকতে পারে?

সোফায় বসার আগে জুলি বাধা দিল, ওঃ নো! আজকের এমন আবহাওয়ায় এই বন্ধ ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। আমার সঙ্গে অন্য একটা ঘরে আসা হোক। সেখানে অন্তত অবাঞ্ছিত অতিথিরা আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না। প্লিজ। বলার ভঙ্গীতে এমন একটা আদুরে ভঙ্গী আনল জুলি যে ভাস্কর নিজের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করল। কিন্তু অন্য ঘর কেন? সেই গুণ্ডা টাইপের বারম্যানটা কি কাছে-পিঠে ওৎ পেতে আছে? সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল। রিভলবারের স্পর্শ তাকে অনেকটা নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে দিল। জুলি শেরিং তখন চলতে শুরু করেছে। টাইট খাটো লাল শর্টস তার ভারি নিতম্বকে শাসন করার নিষ্ফল চেষ্টা চালাচ্ছিল। এই দৃশ্যের সামনে পৃথিবীর সেরা সন্ন্যাসীকেও সমস্যায় পড়তে হবে। কেন যে সেকালে মুনিঋষিদের মতিভ্রম হত আজ বোঝা গেল।

জুলি তাকে যে ঘরটায় নিয়ে এল তার তিনদিকে কাচের দেওয়াল, ছাদেও স্বচ্ছ কাচের ঢাল। দেওয়ালের কাচে এমন একটা ঘষা ভাব আছে যা দেখলেই ভাস্কর বুঝল বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যাবে না, সে স্পষ্ট বাগান এবং আকাশে মেঘ দেখতে পেল। এখানে বেতের হেলানো রঙিন চেয়ার যাতে নরম কুশন দেওয়া। তার একটায় জুলি বসলে মুখোমুখি বসল ভাস্কর। আশ্চর্য, চারদিক বন্ধ মনে হচ্ছে তা সত্ত্বেও একটা হিমেল বাতাস পাক খাচ্ছে এই ঘরে। সত্যি, জুলি এই পোশাকে সামনে না বসলে দম বন্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই।

দুটো পা আড়াআড়ি ভাঁজ করে জুলি বলল, দুঃখের খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছেন? প্রধান মারা গেছে।

চমকে তাকাল ভাস্কর। এই সংবাদ জুলি পেয়ে গেছে।

জুলি হাসল, আজ সকালে আমি ফুল দিতে গিয়েছিলাম। বেচারা! যাক, ব্রেকফাস্ট আনতে বলি?

একটু পরে। ভাস্কর কোনো রকমে উচ্চারণ করল।

আপনাকে আজ খুব হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে। রিয়েলি, অনেককাল পরে আমি একজন সুপুরুষ দেখলাম। আশঙ্কা করছি আপনার বান্ধবীর সংখ্যা আপনি

নিজেও জানেন না ! ঠোঁটে আলতো হাসি জুলির।

ভাস্কর বুঝতে পারছিল ক্রমশ তার ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে যাচ্ছে জুলি। এ আর এক সম্মোহন। এখনই কাজের কথায় আসা উচিত। সে বলল, মিসেস শেরিং—!

বল শুধু জুলি। নামটা মিষ্টি নয় ?

ওয়েল, জুলি। আমার কোম্পানী মনে করে মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। প্রধান আমাকে সে তথ্য দিয়েছে—।

সে তথ্য আর কাজে লাগবে না। হি ইজ ডেড। আচমকা উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল জুলি, আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে তাই বলুন।

হাসল ভাস্কর। জুলি যত উত্তেজিত হবে তত ভাল। সে প্রশ্ন করল, কোন সাধারণ মানুষ তার বাড়ির চারপাশে ইলেকট্রিক অয়ার লুকিয়ে রাখে না। আপনি কেন রেখেছেন ?

তার সঙ্গে মিস্টার শেরিংয়ের মৃত্যুর কি সম্পর্ক ?

আমি আসছি সে প্রসঙ্গে। জবাব দিন।

এইটে আপনার এক্তিয়ারের বাইরে। কিন্তু আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। সুতরাং আমি কথা বলছি। যেভাবে উত্তেজিত হয়েছিল প্রায় সেইভাবেই শান্ত হয়ে গেল জুলি, আমার বাড়িতে একজোড়া বুদ্ধমূর্তি আছে। যেটাকে আপনি বাইরের ঘরে দেখেছেন সেটা নকল। আসলটি ভিতরে। ওই মূর্তিটির ওপর অনেক টিবেটিয়ান এবং আমেরিকানদের লোভ আছে। এর আগে কয়েকবার চেষ্টা হয়েছিল মূর্তিটি চুরি করার। স্রেফ সিকিউরিটির জন্যে ওই অয়ার লাগিয়েছি। এবং এটা পুলিসের অনুমতি নিয়ে।

পুলিস আপনাকে অনুমতি দিয়েছে ?

হ্যাঁ, রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

কিন্তু প্রধান বলেছে সকালেও, আপনি বাড়ি না থাকলে ওটা চালু থাকে।

হয়তো ভুলে অফ্ করা হয়নি।

আপনার মেয়ের লিগ্যাল পেপারস আছে এদেশে থাকার ?

আমার মেয়ে ? এখানে আমার মেয়েকে আপনি কোথায় পেলেন ?

এই বাড়িতে একটি তরুণী নেই ? চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল ভাস্কর। কিন্তু চশমার দেওয়াল কি করে ডিঙোবে সে ?

আমি ছাড়া এখানে কোন মহিলা থাকে না। অবশ্য আমি জানি না আপনি আমাকে তরুণী বলতে চাইবেন কিনা ? মদির হাসি হঠাৎ ঝরনার মত ছিটকে উঠল।

মিথ্যে কথা বলছে। ভাস্কর নিজের মনে বলল। সে যে চাক্ষুষ করে গেছে সেটা তো ইনি জানেন না। সে হাসল, কথাটা কি সত্যি ?

প্রধান আপনাকে ভুল তথ্য দিয়েছে।

আমি যদি বাড়িটা ঘুরে দেখতে চাই ?

স্বচ্ছন্দে। ঠোঁট কামড়াল জুলি।

একটু অবাক হল ভাস্কর। এতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কি করে কথাটা বলল জুলি ? মেয়েটি যদি এই বাড়িতে থাকে ? হঠাৎ তার মনে হল, ওকে এখান থেকে গত রাত্রে সরিয়ে দেওয়া হয়নি তো ? না-খুঁজতে চাওয়া বোকামি হবে। সে হেসে বলল, বিশ্বাস করলাম।

খুশি হল জুলি, বিশ্বাসই দুটো মানুষকে কাছে আনে। আপনার নামটা পড়েছি। কিন্তু কোথায় থাকেন তা জানি না।

কলকাতায়।

ওহ্ ! কি করে থাকেন ? চিৎকার গোলমাল ! বিবাহিত ?

প্রসঙ্গান্তরে দ্রুত চলে যাওয়ার দক্ষতা দেখে ভাল লাগল ভাস্করের, নাঃ ! এখনও সময় করে উঠতে পারিনি ! মিস্টার শেরিং কোন্ সাপের বিষ পছন্দ করতেন ?

মুহূর্তেই আবর রক্ত জমল মুখে, সেটা মিস্টার শেরিং জবাব দিতে পারতেন। আমি ওঁর স্ত্রী তার মানে এই নয় আমাকে সব খবর জানতে হবে।

ঠিকই। মাথা নাড়ল ভাস্কর, যদি আপনি নামচে বস্তিতে সেই বুড়ো সাপুড়ের কাছে বিষ আনতে না যেতেন, তাহলে আপনার কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি থাকতো। তাই না ?

এবার স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে বেশ জোরে হেসে উঠলেন মহিলা। তারপর একেবারে ভাস্করের সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমার চিরকাল ভাল লাগে। যত দেখছি যত শুনছি তত আমার ভাল লাগাটা বাড়ছে। হাত মেলান, সব কথা বলছি।

ভাস্কর চোখ তুলতেই ঝুঁকে পড়া জুলির গেঞ্জিকে হাঁসফাস করতে দেখল। সম্মোহিতের মত সে হাতে হাত মেলাতেই জুলি সোজা হয়ে বলল, গুড। শুনুন, আমার স্বামী নেশা করতেন। প্রথমে মদ। তারপর গাঁজা। তারপর পাউডার। আমাদের বয়সের পার্থক্য ছিল বটে কিন্তু এই নেশার জন্যে আমাদের দাম্পত্য জীবন বলতে কিছু ছিল না ! শেষ পর্যন্ত ছোট সাপের ছোবল নিতেন। তাতেও নেশা ফিকে হয়ে গেলে শঙ্খচূড় সাপের বিষ ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে নিতেন। কিন্তু উনি মারা গেছেন স্রেফ হার্ট-অ্যাটাকে। দুবার উনি আমাকে বাধ্য করেছিলেন সেই সাপুড়ের কাছে যেতে। কিন্তু এসব আপনি ওর মৃত্যুর কারণ হিসেবে আদালতে প্রমাণ করতে পারবেন না। ডাক্তার যে ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাতে এসবের উল্লেখ নেই।

ভাস্কর মাথা নাড়ল। সব ঠিক। শুধু শেষ সত্যটি বললেন না মহিলা। জুলি এগিয়ে এল এবার। একটা হাত আলতো করে তুলে দিল ভাস্করের কাঁধে, বিশ্বাস করুন আমাকে। এই দেশে এসে এখন আমি একা। ওই টাকাটা আমাকে

নিরাপত্তা দেবে। আপনি আমার কথাও ভাবুন।

কি ভাবতে হবে বলুন?

আপনি আমার পাশে দাঁড়ান।

তারপর?

আপনাকে আমার ভাল লেগেছে।

আমারও। বলে উঠে দাঁড়াল ভাস্কর। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত খুশিতে তার একটা হাত তুলে নিয়ে তাতে নিজের গাল চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতেই ভাস্কর বলে উঠল, কেউ আসছে।

আসুক।

আমরা বোধ হয় বড্ড তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি। ঝড়ে কিছুই নড়ে না।

উঁহু, আমি ওসব থিওরিতে বিশ্বাস করি না। যখন হওয়ার হয় তখন যে কোন ভাবেই তা হতে পারে। জুলির চোখ বন্ধ তখনও।

সেই সময় পেছনের দরজার দিকে চোখ যেতেই মনে হল কিছু একটা সরে গেল সেখান থেকে। তাদের কেউ লক্ষ্য করছে? একটা শব্দ হচ্ছিল যেন তখন থেকে এক নাগাড়ে। সে তাকাতেই শব্দটা থেমে গেল। এবার যেন শরীরে সাড় ফিরে পেল ভাস্কর। বেচারা প্রধান বোধহয় এই ভাবেই ভুল করেছিল।

সে ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল, আমি এবার বাড়িটা ঘুরে দেখতে চাই। আপত্তি নেই তো এখন?

নিশ্চয়ই না। কিন্তু এখনও কি অবিশ্বাসের কারণ আছে?

আমার চোখ এবং কানের মধ্যে কোনো ফারাক রাখতে চাই না। আসুন। খানিকটা অনিচ্ছায় জুলি তাকে পেছনের দরজায় নিয়ে এল। তারপর একটার পর একটা ঘর। কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই। জুলির শোয়ার ঘরে এসে ভাস্কর বলল, মিস্টার শেরিংয়ের জিনিসপত্র এখানে দেখছি না কেন? মনে হয় ভদ্রলোক এই বাড়িতেই থাকতেন না।

বাজুতে চিমটি কাটল আলতো করে জুলি, আমার শোয়ার ঘরে ও কেন থাকবে? বলেছি না আমাদের দাম্পত্য জীবন ছিল না।

বাড়িতে কেউ নেই?

এ প্রশ্ন কেন?

কাউকে দেখছি না। অথচ তখন বললেন ব্রেকফাস্ট আনতে বলব? কাকে আনতে বলতেন?

ও। আমাদের ওপাশে একটা আউটহাউস আছে! এখন এই বাংলোয় আমি —আমরা একা। একটা চোখ ঈষৎ কাঁপল জুলির।

আমি একবার মিঃ শেরিংয়ের ঘরে যাব।

ওঃ ভাস্কর! বিলিভ মি প্লিজ। এসো।

প্রায় টানতে টানতে চতুর্থ ঘরে নিয়ে গেল জুলি তাকে। এই সেই ঘর।

BANGLAPDF.NET

দেওয়াল ভর্তি বই। তলায় কার্পেট। সে জিজ্ঞাসা করল, এইসব বই কে পড়তেন? মিস্টার শেরিং?

না। বাড়িটা ছিল হ্যারল্ড টমসন নামে একজনের। সে আমাদের এটা বিক্রী করে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। বইগুলো নিয়ে যায়নি। মিস্টার শেরিং, এখানে শুতেন, যখন বাড়িতে থাকতেন।

ওই বইগুলো তিনি পড়তেন না?

যে লোকটা চব্বিশ ঘণ্টা নেশায় ডুবে থাকত তার বই পড়ার সময় কোথায়? আর আমি অত পুরনো মোটা বইতে ইণ্টারেস্টেড নই।

আপনাদের সেই দ্বিতীয় বুদ্ধমূর্তি কোথায়? দেখলাম না তো!

আমার ঘরে একটা সুটকেশে রাখা হয়েছে। আমি বাইরে রাখতে সাহস পাই না। মিস্টার শেরিং ওইটে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল এই মূর্তির ইজ্জত রেখো আর এই বাড়ি বিক্রী কর না।

নিয়ে আসুন মূর্তিটা। হুকুমের ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল ভাস্কর। 'এই বাড়ি বিক্রী কোরো না।' কথাটার মধ্যে কোনো তাৎপর্য ছিল, না জুলি বানিয়ে বলল? জুলি দুটো মিথ্যে বলছে। এক, কাল অন্য মেয়ে এখানে ছিল, দুই, আজ এই বাড়িতে আর কেউ আছে যার অস্তিত্ব তার অনুভূতিতে সে টের পাচ্ছে। জুলি খানিকটা বিরক্ত হয়ে পাশের ঘরে চলে গেছে মূর্তিটা আনতে। হঠাৎ ভাস্করের মনে এল, জুলি কি এই ঘরে যে লুকনো গর্ত আছে তার হদিশ জানে না? সে একটা বাক্স ওখান থেকে নিয়েছে কিন্তু আর একটা কাঠের বাক্স গর্তে ছিল। তাতে কি আছে? ঠিক তখনই জুলি সামনে এসে দাঁড়াল। ঠিক দরজার ফ্রেমে। ওর হাতে চমৎকার এক বুদ্ধমূর্তি। কালো পাথরের খোদাই করা, নিখুঁত। জুলি বলল, এইটে আমাদের পারিবারিক সম্পদ। এর ওপর লোভ অনেকের। বিশ্বাস হল? ভাস্কর এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটি স্পর্শ করতে যেতেই জুলি এক পা পিছিয়ে গেল, নাঃ। এই পরিবারের বাইরের কারও একে স্পর্শ করার অধিকার নেই। ওর গলার স্বরে প্রতিরোধ।

ঝুঁকে দেখতে লাগল ভাস্কর। স্পর্শ না করে যতটা দেখা যায়। এবং ঠিক তখনই জুলির শরীরের পাশ দিয়ে ওপাশের ঘরের দেওয়ালটা চোখে পড়ল। দেওয়ালের গা জুড়ে বিশাল পর্দা। পর্দার তলায় দুটো চামড়ার জুতো। একটা জুতো সামান্য নড়ল। ভাস্কর অনেক চেষ্টায় নিজের ভাবান্তর প্রকাশ করল না। ছায়াটার হদিশ পাওয়া গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, এই মূর্তির দাম কত?

অন্তত তিন লক্ষ ডলার। কিংবা তারও বেশী হতে পারে।

তিন লক্ষ ডলার? আমি এইরকম একটা মূর্তির খবর জানি যা দশ লাখ ডলারে বিক্রী হয়েছিল লস-এঞ্জেলেসের এক নিলামে। এটা বিক্রী করলেই তো আপনি বড়লোক। ইনসুরেন্সে ওই টাকা তো এর কাছে সামান্য। তাই না?

এটা বিক্রী করা অসম্ভব। কিন্তু ওই টাকাটা আমার চাই। আর সেই আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। যাই, এটাকে রেখে আসি। জুলি পেছন ফিরে এগিয়ে যেতেই ভাস্কর আবার জোড়া জুতোর দিকে তাকাল। পর্দার আড়ালে জুতোজোড়া সরে সরে যাচ্ছে। ভাস্কর যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে দাঁড়াল দরজার পাশে। আর সেই সময় টিবেটিয়ানটির মুখ বেরিয়ে এল পর্দার ফাঁক দিয়ে। উঁকি মেয়ে সে এই দরজার দিকে একবার দেখে চোখের পলকে ঢুকে গেল জুলির ঘরে। লোকটা যে গেল কিন্তু এতটুকু শব্দ হল না। এই লোকটিকেই সে দেখেছিল প্রথমদিন পানশালার কাউণ্টারে। সেই সময় জুলি ফিরে এল নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে।

ভাস্কর প্রশ্ন করল,—আচ্ছা, ওই মূর্তিটার কথা আপনার পরিচারকরা জানে? ওর দামের কথা?

না। দামের কথাও জানে না। তবে জানে ড্রইংরুমের মূর্তিটাই মূল্যবান।

ওরাও তো এটা চুরি করতে পারে!

না। ওরা বিশ্বস্ত। তাছাড়া ওরা জানে না আমি কোথায় রেখেছি মূর্তিটাকে। হাসল জুলি।

ঠিক নয়। এই মুহূর্তে আপনার ঘরে একজন ঢুকেছে। যাকে আপনি পাহারা দেবার কাজে আপনার পানমালা থেকে আনিয়েছেন। জুলি, আপনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন।

ঠোঁট কামড়াল জুলি। তারপর বলল, এ থেকে প্রমাণ হয় না আমার স্বামীর মৃত্যু অস্বাভাবিক।

কিন্তু ওই মূর্তি এই মুহূর্তে চুরি হয়ে যেতে পারে জুলি!

নাঃ। বলেই জুলি দৌড়ালো। কিন্তু দু-পা যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়াল সে। বুটজোড়া এবার দরজার সামনে দাঁড়াল। তার এক হাতে কালো পিস্তল। অন্য হাতে কাগজে মোড়া প্যাকেট।

জুলি চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে বিদ্যুৎগতিতে সরে দাঁড়াল। তারপর পিস্তলটা ভাস্করের দিকে উঁচিয়ে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জুলি মরীয়া হয়ে তেড়ে আসছিল কিন্তু তার আগেই লোকটা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জুলি এবার চিৎকার করে উঠল, বিশ্বাসঘাতক! ওকে আমার আনাই ভুল হয়ে ছিল। হাউ হাউ করে কেঁদে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মেয়েটা। খুব অসহায় দেখাচ্ছিল এই মুহূর্তে। কয়েক পলক ওর দিকে তাকিয়ে ভাস্কর চটপট মিস্টার শেরিংয়ের ঘরে চলে এল। তারপর শেলফ থেকে সেই বইটা সরিয়ে বোতাম টিপতেই পায়ের তলার কার্পেট ঝুলে পড়ল। দ্রুত হাতে কার্পেট সরাতেই সে দ্বিতীয় বাক্সটাকে দেখতে পেল গর্তের মধ্যে। সন্তর্পণে গর্তটা থেকে বাক্স তুলতেই মনে হল ওটা খুব হাল্কা। ঢাকনা খুলে মাথা নাড়ল সে। বাক্সটা খালি।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় অস্ফুট শব্দ হল। ভাস্কর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল জুলি অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে এখনও জল।

ওটা কি? ওখানে গর্ত কি ভাবে এল? ছুটে এল জুলি। ওর চোখে বিস্ময়! ভাস্করের হাত থেকে বাক্সটা টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, এই বাক্স কোত্থেকে এল?

তুমি জানতে না এই গর্তের কথা!

না। জানতাম না। এই ঘরে আমি আসতাম না।

মিথ্যে কথা।

বিশ্বাস কর। আমি এর কিছুই বুঝতে পারছি না। জুলি চিৎকার করে উঠল, কিন্তু এই বাক্সটাকে আমি চিনি। এতেই ওই বুদ্ধ মূর্তিটা ছিল। ও জানত। নিশ্চয়ই জানত। কিন্তু আমাকে মূর্তিটা দিয়ে ও এখানে বাক্সটা রাখতে গেল কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করল জুলি।

এই প্রথম বিশ্বাস করল সে।

ভাস্কর জুলির কাঁধে হাত রাখল, তোমার মেয়ে এখন কোথায়? মিথ্যে কথা বললে নিজেরই ক্ষতি হবে।

দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল জুলি। অনেক কষ্টে নিজেকে ফিরে পেল সে, ঘুমে।

কাল রাত্রে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে?

হ্যাঁ।

গুরুদেব কোথায়?

আবার তাকাল জুলি। ইতস্তত করল। ভাস্কর বলল, সত্যি কথা বললে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

অজ্ঞান হয়ে আছে। লোকটা আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিল।

কি বলেছিল?

বলেছিল ও দেখেছে আমি প্রধানকে খুন করেছি। কিন্তু বিশ্বাস কর আমি তা করতে চাইনি। আমি সামান্য ঠেলেছিলাম কিন্তু ও পুতুলের মত খাদে চলে গেল। আমি দেখেছি।

তুমি দেখেছ? এই প্রথম স্বস্তি পেল জুলি, তাহলে বল আমি খুন করতে চেয়েছিলাম কিনা?

না। কিন্তু আর একটা কথা বল। মিস্টার শেরিং ইঞ্জেকশন নিয়েছিলেন কোথায়? পানশালায় না এখানে?

ওর দুটো সিরিঞ্জ ছিল। একটাতে সব সময় বিষভরা থাকত। প্রয়োজন হলেই নিত। ওই বিষের ভয়ে আমরা তটস্থ থাকতাম। শেষ দিকে বলত সাপের বিষ ইনজেক্ট করেও নাকি বেশিক্ষণ আরাম হচ্ছে না। ও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই গর্ত কোত্থেকে এল? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি ওই

বিশ্বাসঘাতকটাকে ছাড়ব না। ওকে আমি খুন করবই। আমাদের পারিবারিক বুদ্ধমূর্তি ওটা। হিংস্র ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল জুলি, তুমি ওকে যেতে দিলে কেন?

ও কোথাও যায়নি। সাধারণ গলায় জানাল ভাস্কর।

মানে?

তার আগে বল গুরুদেবের অজ্ঞান শরীরটা কোথায় আছে?

ঘুমে। যে বাড়িতে আমার মেয়ে আছে। ও ওকে পাহারা দিচ্ছে।

জ্ঞান ফিরে এলে তোমার মেয়ে পারবে সামলাতে?

ওর শরীর বাঁধা আছে শক্ত করে। উঠতে পারবে না।

কিন্তু—।

এসো। জুলির হাত ধরে বেরিয়ে এল ভাস্কর। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল জুলি। লনে পুলিস গিজগিজ করছে। অনিল মিত্র ওদের দেখে এগিয়ে এল, লোকটাকে ধরেছি। বুদ্ধমূর্তি নিয়ে পালাচ্ছিল।

থ্যাংক ইউ। হাত বাড়িয়ে বুদ্ধমূর্তিটা গ্রহণ করল ভাস্কর।

কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অনিল মিত্র বললেন।

ঘুম কি জুরিসডিকশনে?

হ্যাঁ। কেন?

তাহলে আমাদের পেছনে পেছনে চলে এসো। ওখানে গিয়ে কিছু ইণ্টারেস্টিং তথ্য দেব। এসো জুলি, তোমার গাড়িটা নাও। পুলিসের গাড়ি নিয়ে প্রথমে যাওয়া ঠিক হবে না। তাড়া দিল ভাস্কর।

না! জুলি শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

ভাস্কর চট করে অনিল মিত্রকে দেখে নিল। অনিল যেন এখনই কোনো গন্ধ না পায়! তারপর চাপা গলায় বলল, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আমার সঙ্গে চল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় জুলি গাড়িতে উঠল, পাশে ভাস্কর। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, অনিল, তোমরা এমন ভাবে ফলো কর যাতে কেউ বুঝতে না পারে। যে বাড়িতে ঢুকব সেটা কভার করে অপেক্ষা করবে আধঘণ্টা। আমি না বের হলে চার্জ করবে।

বাট হোয়াই? অনিল মিত্র চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল আবার।

এসো বলছি। গাড়িটা যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসছে তখন পদম বাহাদুরকে নজরে এল! খুব উৎসাহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পুলিস দেখে এগোচ্ছে না। হাত নাড়ল ভাস্কর, হোটেলে থাকিস। এখনই ফিরছি।

কথাটা পছন্দ হল না পদমের। সে বোধ হয় আরও উত্তেজনা চাইছিল। কিন্তু ছেলেটাকে যা যা বলেছিল তা মান্য করেছে। অনিল মিত্রকে খবর দিয়ে না আনলে লোকটি গ্রেফতার হত না।

বুদ্ধমূর্তিটা মাঝখানে সিটের ওপর, জুলির হাতে স্টিয়ারিঙ। সে বলল,

আমি জানি তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবে প্রধানের খুনের কেসে। কিন্তু তা যদি আমি হতে না দিই ?

কি রকম ? কৌতুক করে বলল ভাস্কর।

যদি এই গাড়িটা নিয়ে খাদে ঝাঁপ দিই ?

চমকে উঠল ভাস্কর। এখন তাদের ডানদিকে বিশাল খাদ, বাঁ দিকে পাহাড়। সে আড় চোখে জুলির দিকে তাকাল। জুলির নগ্ন পা, সতেজ বুক আর আকর্ষণ করছে না। তরল একটা হিমস্রোত নেমে এল। তার মনে হল ও যা বলছে তা অবহেলায় করতে পারে। তাহলে কিছু করার উপায় থাকবে না। সে নির্লিপ্ত হবার চেষ্টা করল। এখন প্রার্থনার সুরে কথা বললে জুলির জেদ চেপে যাবে। একটা কাণ্ড ঘটাতে দ্বিধা করবে না কারণ গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ওর হাতে। ভাস্কর বলল, তোমাদের পারিবারিক বুদ্ধমূর্তিটা বেহাত হয়ে যাবে তাহলে।

মানে ? চমকে উঠে পাশের মূর্তিটার দিকে তাকাল।

আমার যতদূর বিশ্বাস এই মূর্তি জাল।

জাল ?

হ্যাঁ। আসল মূর্তি ছিল ওই গর্তের দ্বিতীয় বাক্সে ! এটা আমার অনুমান। তুমি বললে বাক্সটায় মূর্তি ছিল। অথচ মিস্টার শেরিং তোমাকে বাক্সটা না দিয়ে লুকিয়ে রাখলেন গোপনে জায়গায়। এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।

তুমি কি বলতে চাও এটা—মূর্তিটায় হাত দিল জুলি।

প্লিজ অপেক্ষা কর জুলি।

বাড়িটা ছবির মত একটা পাহাড়ের মাথায়। পথে আসার সময় ওরা লক্ষ্য করেছিল পুলিসের গাড়ি বেশ দূরত্ব রেখে আসছে। বাড়িটার সামনে গাড়িটা দাঁড় করাতেই ভাস্কর লাফিয়ে নামল। জুলি নামতেই সে বলল, পেছন দিকে কোন দরজা আছে ?

হ্যাঁ।

বাড়িতে আর কে কে আছে ?

ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

তুমি সামনের দরজায় নক কর। কথাটা বলে দ্রুত পায়ে ভাস্কর পেছনের দরজায় হানা দিল। সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। কিন্তু এপাশে একটা জানলার পাল্লা খোলা। কিন্তু তার গায়ে মোটা গ্রিল। অতএব ভাস্করকে আবার সামনে চলে আসতে হল।

জুলি নেই। দরজাটা খোলা।

খুব সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল ভাস্কর। আর তখনই ভেতরের ঘরে আওয়াজ হল। কাল রাত্রে আমাকে খুব মারা হয়েছিল না? মেয়েকে পাহারায় রাখা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা থাপ্পরের শব্দ এবং জুলির আর্তনাদ। লোকটি চাপা গলায় বলল, গাড়িতে আর কেউ ছিল? আমার দিকে তাকাও।

হ্যাঁ।

কে?

ভাস্কর।

ঠিক তখনই পা চালালো ভাস্কর। সতর্ক ভঙ্গীতে অথচ অত্যন্ত দ্রুত পায়ে সে দূরত্বটা অতিক্রম করল, মাথার ওপরে হাত তুলুন। নইলে খুলি উড়ে যাবে।

চট করে ফিরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল গুরুদেব কিন্তু ধমকে উঠল ভাস্কর, একদম চালাকি করার চেষ্টা করবেন না।

গুরুদেব যেন কি করা যায় ঠাওর করতে পারছে না। আর সময় নষ্ট করল না ভাস্কর। রিভলবারের বাঁট দিয়ে আধা জোরে আঘাত করল সে গুরুদেবের মাথায় সঙ্গে সঙ্গে কাটা কলাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল গুরুদেব। ততক্ষণে জুলি ছুটে গিয়েছে পাশের ঘরে। গিয়ে চিৎকার করে উঠল।

ভাস্কর বুঝল গুরুদেবেব সম্বিৎ ফিরতে অন্ততঃ মিনিট দশেক সময় লাগবে। সে একটা কাপড়ের টুকরোয় ওর চোখ দুটো বাঁধল। তারপর ধীরে ধীরে পাশের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। পাথরের মত বসে আছে একটি সতেরো বছরের মেয়ে। চোখ নড়ছে না। শরীর শক্ত। আর তাকে দু হাতে ধরে ঝাঁকিয়ে জুলি বলল, কথা বল্, তুই এমন করছিস কেন? কি হয়েছে তোর? কথা বল্?

তোমার মেয়ে?

হ্যাঁ। যা ইচ্ছে করো তুমি, ও আমার মেয়ে।

আমি কিছুই করতে চাই না। তবে কিছুক্ষণ ওকে ডেকে কোনো লাভ হবে না। ও এখন সম্মোহিত। তারপর ওর চোখের সামনে চোখ রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, বুদ্ধমূর্তিটা কোথায়?

পাশের ঘরে। খাটের তলায়। বিড়-বিড় করে বলল মেয়েটি। তার ঠোঁট যেন কাঁপল না।

দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকল ভাস্কর। তারপর বুদ্ধমূর্তিটা সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল জুলির কাছে। মেয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে অসহায় ভঙ্গীতে বসে আছে সে। এই কয়েক মিনিটেই তাকে খুব বয়স্কা দেখাচ্ছে। বুদ্ধমূর্তির দিকে অবাক চোখে তাকাল সে।

ভাস্কর বলল, এই মূর্তি মিস্টার শেরিং ওই গর্তের বাক্সে রেখেছিলেন লুকিয়ে। এক বাড়িতে থেকে তুমি যে তা জানতে না এটা আমি বিশ্বাস করি। তোমার মেয়ে দেখেছিল এটাকে। তাই এখানে চলে আসার সময় ও লুকিয়ে

নিয়ে এসেছিল। কারণ বৌদ্ধ এবং এই পরিবারের মানুষ হিসেবে ওর নিশ্চয়ই লোভ হয়েছিল মূর্তিটার ওপর। ওর কোন দোষ নেই। বাইরে যেটা ছিল তোমার কাছে সেটা জাল। ওই গর্তে আর একটা বাক্স ছিল। তাতে ছিল দুটো অ্যাসিডের মিশ্রণ আর একটা অব্যবহৃত সিরিঞ্জ। তোমার কথাই সত্যি। মিস্টার শেরিং গোপনে অ্যাসিড নেবার ঝুঁকি নিচ্ছিলেন। শরীরে ইনজেকশনে অ্যাসিড পুরে বাকিটা গর্তে রেখে উনি পানশালায় গিয়েছিলেন। বাকিটা তোমরা জানো। না জুলি, তুমি মিস্টার শেরিংকে খুন করোনি। তুমি চাওনি প্রধান নিহত হোক। আইন দিয়ে জোর করে তোমাকে বাঁধা যায় হয়তো কিন্তু আমি সেটা চাই না। কিন্তু তুমি স্বামীর ইনসুরেন্সের টাকা চেয়ো না। ওটা তো জেনে শুনেই আত্মহত্যা। ঝুঁকি নেওয়া, যদি না মরি তাহলে ভাল লাগবে—এই রকম। তোমার দোকান আছে আর এই বুদ্ধমূর্তি রইল। মেয়ের জন্যে কাগজপত্র ঠিক করে নিও। আমি চলি। ওই লোকটার ব্যবস্থা পুলিস করবে।

দুটো পাথরের মূর্তিকে ঘরে রেখে বাইরের ঘরে এল ভাস্কর। গুরুদেব তখনও বেহুঁস। ভারি পায়ে সে আকাশের নিচে আসতেই দেখল অনিল মিত্র এগিয়ে আসছেন। বাহিনী নিয়ে। ক্লান্ত গলায় ভাস্কর বলল, ভেতরে যাও। ওখানে তোমার আসামী আছে। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করল।